দুঃস্বপ্ন

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়—

প্রীতিভাজনেষু

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

মহানগরী, অম্লমধুর, আলেখ্য, আবর্ত্ত, কালো মেঘ, নিঃসঙ্গ, পটভূমিকা, প্রেম ও পৃথিবী, ফানুস, মজা নদীর কথা, মায়াজাল, মুহূর্ত্তের মূল্য, রতন-দীঘির জমিদার-বধূ, শাশ্বত পিপাসা।

রাজমাতা

১

জেলা-কোর্টের নামজাদা মুহুরী হরিশবাবু যেদিন এ পৃথিবীর হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়া উর্দ্ধ জগতে উচ্চতর পদের জন্য সহসা প্রয়াণ করিলেন, তখন তাঁহার বিধবা অনেকগুলি পুত্রকন্যা ও যৎসামান্য অর্থ লইয়া সত্যই জগৎ অন্ধকার দেখিলেন। সাত পুত্র ও চার কন্যা। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স কুড়ি, এবং একমাত্র আশার বিষয় এই যে, সর্ব্বকনিষ্ঠ কন্যা ব্যতীত আর সকলেই বিবাহিত। বড়টি বিবাহ শেষ করিয়া বৈধব্য আশ্রয় করিয়াছে এবং মায়ের কাছেই বাস করিতেছে।

দূর এবং নিকট সম্পর্কের জ্ঞাতি-কুটুম্ব অনেকেই আছেন; কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তির পূর্ব্বে যেরূপ উষ্ণ নিঃশ্বাস ও সজল সহানুভূতির অভিষেকে সহায়হীন বিধবার অন্তরে ক্ষীণ আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন, কাজকর্ম্ম চুকিয়া গেলে তেমনি একযোগে অন্তর্দ্ধান করিয়া জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, যথার্থই জ্ঞাতি তাঁহারা। সুখ-সম্পদের মধ্যে চিরকাল পাশে দাঁড়াইতে সক্ষম হইলেও, দুঃখ-ঝঞ্ঝায় মাথা পাতিবার সহিষ্ণুতা তাঁহাদের নাই।

প্রতিবাসীরা সান্ত্বনা দিল, "ওপর পানে চেয়ে বুক বাঁধ মা, তিনিই এদের মানুষ করে দেবেন। ষেটের সাতটি ছেলে মানুষ-মুনুষ হয়ে উঠুক—তোমার ভাবনা কিসের? ছিলে রাজরাণী, হবে সাত রাজার মা।"

যে তৈলবিন্দু সঞ্চয় করিয়া সংসার-চক্র নিঃশব্দে সুশৃঙ্খলে চলে—অভাব শুধু তাহারই। কর্ত্তা সুবিবেচনা করিয়া কয়েক বিঘা জমি রাখিয়া

গিয়াছেন—তাহাতে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের দুঃখ নাই; কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহও আট-দশ বৎসর পরে দিলেই চলিবে; কিন্তু ভাবী রাজমাতা হইতে হইলে সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষাব ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সে অর্থ আসে কোথা হইতে?

জ্যেষ্ঠ পুত্র কমল মাকে বলিল, "বি-এ-টা আর দিতে পারলুম না, মা, চাক্‌রীর চেষ্টাই দেখি।"

মা একবারমাত্র ক্ষীণ আপত্তি করিয়া বলিলেন, "আব দুদিন না-হয়—"

পুত্র বলিল "অবস্থা তুমিও জান—আমিও জানি। আর পাশ করেই বা লাভ কি? সেই তো চাকরী খুঁজে মবতে হবে।" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

জননীও দীর্ঘনিশ্বাসে সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

মেজ শিশিরের পড়াশুনায় কোনকালেই মনোযোগ ছিল না। খাতা পেন্সিল বই বহিয়া, শুধু বাপের তাড়নায় স্কুলে হাজিরা দিত। এখন মাথার উপর শাসনের বেত্রখানি অন্তর্হিত হইতেই ঘরের একপ্রান্তে বইখাতা ফেলিয়া মাকে আসিয়া জানাইল,—ওসব কার্য্য তাহার দ্বারা হইবে না। সে বরং কোন দোকানে থাকিয়া ব্যবসার মূলসূত্র অনুসন্ধান করিবে।

জননী কোন উত্তর না দিয়া চৌদ্দ বৎসরের পুত্র অরুণের মুখের পানে হতাশাভরে চাহিলেন।

অরুণ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বড়-দা ত চাক্‌রী করবে মা, আমি পড়বো। দোহাই তোমার, স্কুল ছাড়িয়ে দিয়ো না"

মা কোন উত্তর না দিয়া তাহাকে সস্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ললাটে স্নিগ্ধ চুম্বন আঁকিয়া দিলেন।

আর চারিটি নিতান্ত ছোট। কেহ পঞ্চম শ্রেণীতে, কেহ সপ্তম শ্রেণীতে, কেহ বা স্বরবর্ণের এবং সর্ব্বকনিষ্ঠটি মায়ের কোল পূর্ণ করিয়া আদর-আব্দারের—পাঠ লইয়া থাকে। তাহাদের পানে চাহিয়া ভাবী রাজমাতা একটি ব্যথাভরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

কমল অনেক চেষ্টা করিয়া, সৌভাগ্যক্রমেই বলিতে হইবে,- একটা মার্চ্চেণ্ট আপিসে অল্প মাহিনার একটি চাকুরী পাইয়াছে। নিজের খরচ চালাইয়া মাসে মাসে সে পনরটি টাকা বাড়ি পাঠাইয়া দেয়।

শিশির কিছুদিন দোকানে যাতায়াত করিয়া ব্যবসায়ের মূলসূত্রানুসন্ধান ছাড়িয়া দিয়া সখের থিয়েটারের দলে ঢুকিয়াছে। সংসারের পানে সে চাহিয়াও দেখে না। সময় বা অসময়ে হৈ-হৈ করিয়া আসিয়া দু-বেলা আহার সারিয়া যায় এবং দীর্ঘ দিনমান ও রাত্রি বাহিরেই কাটাইয়া দেয়। উপার্জ্জনের অনুযোগ করিলে সাত ভাগের একভাগ জমি দেখাইয়া মাতাকে বুঝাইয়া দেয়—এই অন্নের গ্রাস তার ন্যায্য পাওনা।

অরুণ মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া করে। সংসারের দিকেও তার টান আছে। দশমীর রাত্রিতে নিজের জমানো দু-এক পয়সা দিয়া মায়ের জলখাবারের মিষ্টান্ন কিনিয়া আনে, একাদশীর দিন তাঁহাকে কাজকর্ম্ম করিতে দেয় না। ভাইদের আদর করে, পড়া বলিয়া দেয়।

সকলেই বলে, "এই ছেলেই তোমার সকল দুঃখ দূর করবে।"

মা অন্তর্যামীকে ডাকিয়া মনে মনে বলেন, "রাজরাণী হতে চাই না, ঠাকুর! তুমি শুধু এদের বাঁচিয়ে রেখো।"

জ্যেষ্ঠকন্যা মেনকা সংসার মাথায় করিয়া রাখিয়াছে। হাঁড়ি হেঁসেল ভাঁড়ার সমস্তই তার জিম্মায়। ভাইবোনদের খাওয়ার পরিচর্য্যা, অল্প খরচে নিত্যনূতন ব্যঞ্জনের আস্বাদন, রোগে সেবা, রোদনে সান্ত্বনা সমস্তই

তাহার নিপুণ করের স্পর্শে ও স্নেহ-সুকোমল অন্তরের সান্নিধ্যে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয়।

মধ্যমা ঊষা বিবাহের পর সেই যে শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে আর পিত্রালয়ে আসে নাই। বিবাহের সময় দেনাপাওনার কি সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি না-কি ঘটিয়াছিল—তাহারই ফলে তাহার পরমাশ্রয়ের সকল পূজনীয় ব্যক্তিরাই এই সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এমন কি পিতার মৃত্যুর পরও সে ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

তৃতীয়া রমার বিবাহ কিন্তু অনেক দেখিয়া শুনিয়া সৎ গৃহস্থের ঘরেই দিয়াছিলেন। মাত্র দুই বৎসর হইল এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। উভয় পক্ষই যথাসাধ্য সাধ-আহ্লাদ করিয়া সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছেন। পিতার মৃত্যুতে রমা বড় কান্নাটাই কাঁদিয়াছিল। রমার শ্বশুর নিজেই অভিভাবক হইয়া কাজকর্ম্মের বিশৃঙ্খলা ঘটিতে দেন নাই। রমার স্বামী পশ্চিমে কোথায় চাকরী করে।

ছোট উমা খেলাঘর বাঁধিয়া—পুতুলের বিবাহ দিয়া, সই, গঙ্গাজল, বকুল ফুলের সঙ্গে হাসি-কান্না, কলহ-প্রীতির চর্চ্চা করিয়া এইভাবে তাহার ভাবী জীবনকে সত্যকার সংসারের জন্য তৈয়ারী করিতেছিল। তাহার খেলাঘরে পুতুলের বিবাহ উপলক্ষ্যে ছোট ছোট ভাইগুলি হইতে বড় দিদি পর্য্যন্ত সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া কাঁকরের চাউল, কাল-কাসুন্দা ফলের বীজের ডাউল ও নানাপ্রকার পাতার তরকারী পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেন। আহারান্তে দক্ষিণার ব্যবস্থা করিতে সে ভুলিত না। কয়েক খণ্ড খোলামকুচি ঘসিয়া ঘসিয়া পয়সার আকারে তৈয়ারী করিয়া রাখিত।

বৃহৎ সংসার কিন্তু দিনে দিনে অচল হইয়া উঠিতেছিল। শিশির বাড়িতে শুধু যখন-তখন ভোজন করিয়া যায় না, সঙ্গে সঙ্গে কিছু

পয়সাও জোরজবরদস্তি করিয়া আদায় করে।

মেনকা বলে, "হাঁ রে শিশির, সংসারের এই অবস্থা—তুই একবারও ভাবিস্ না। কমল সেই কোথায় না খেয়ে না প'রে দুঃখে কষ্টে রোজগার ক'রে পনেরটি টাকা পাঠায়, তাই না চলে?"

শিশির উত্তর দেয়, "ইস—তাতেই যেন চলে। জমির ধান হয় না? তা থেকে কিছু বেচে পয়সা জমালেই পার। দাও চার আনা আজ একজনকে দিতে হবে।"

তর্কবিতর্ক করিয়া কোন ফল নাই, দিতেই হয়। মেনকা রাগ করিয়া দু-এক দিন পয়সা দেয় নাই, ফলে ঘরের দু-একখানা বাসন বা অন্য কোন মূল্যবান দ্রব্য অন্তর্হিত হইয়াছে। ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গের মত উহার নিত্য দৌরাত্ম্য এইভাবেই অভাবগ্রস্ত সংসারের সারা দেহে যন্ত্রণা ও দুঃখের সৃষ্টি করে।

*   *   *

সেদিন এগারো বছরের বালক বিমলকে অরুণ নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে করিতে বাড়ি লইয়া আসিল। বিমল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে উঠানের ধুলায় লুটাইয়া পড়িল; অরুণ তাহার পিঠের উপর সপাসপ্ বেত চালাইতে লাগিল। মা ভগ্ন গৃহের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া নীরবে এ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। মেনকা ছুটিয়া আসিয়া অরুণের হাত হইতে বেতগাছা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "করছিস্ কি অরুণ? মেরে ফেলবি নাকি?"

অরুণ চীৎকার করিয়া কহিল, "হ্যাঁ—খুন করব। দাও বেত।" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া যেমন সে বেত লইতে যাইবে, অমনি দাওয়ায় দণ্ডায়মানা জননীর নীরব নিথর মূর্তির পানে চাহিয়া চমকিত হইয়া

উঠিল। কি করুণ বেদনা ও অসহায় মমতা তাঁহার দুটি আয়ত নয়নের সজলস্নিগ্ধ চাহনিতে ফুটিয়া উটিয়াছে! কি মর্ম্মস্পর্শী মৌন অনুযোগ তাঁহার মুখের প্রতি রেখাটিতে সুস্পষ্টরূপে আঁকা!

দ্রুতপদে সে মায়ের নিকটে আসিয়া দুই হাতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বলিল, "মা, বিমলের এমন মতিগতি কেন হ'ল? ক্লাসের ছেলেদের খাতা, পেন্‌সিল, বই, কলম রোজই সে চুরি ক'রতো। আজ হাতে-হাতে ধরা পড়ে গেল। মাষ্টার মশায় তাকে কিছু না ব'লে আমায় ডাকিয়ে এনে বললেন, "ছি! তোমার ভাই এমন। একে শাসন ক'রো! মা, আমার যেন লজ্জায় মাথা কাটা গেল।"

মেনকা বলিল, "কই বাড়ীতে ত খাতা, পেন্‌সিল চুরি করে আন্‌তে দেখিনি!"

অরুণ বলিল, "রোজকে রোজ দোকানে বেচে ফেল্‌ত যে।"

মেনকা ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "বটে! এরই মধ্যে চুরি বিদ্যে। —পয়সায় ওর এত কি দরকার?"

অরুণ বলিল, "ওর পকেটে হাত দিয়ে দেখ, বুঝতে পাব্‌বে। এখনও দুটো সিগারেট রয়েছে।"

অসহ্য রোষে মেনকার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিয়া হাতের বেতগাছি আন্দোলিত করিল।

বিমল ছুটিয়া পলাইল।

মেনকা বলিল, "মেজটাই সবগুলোর মাথা খাবে দেখছি। এখনও বল্‌ছি মা, ওটাকে আর বাড়ি ঢুক্‌তে দিয়ো না।"

মা কোন উত্তর না দিয়া অরুণের হাত ধরিয়া নীরবে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় শিশির বাড়ি ঢুকিয়া হাঁকিল, "এই অরো, বিমলকে মেরেছিস্ কেন ?"

পাঠ-নিরত অরুণ কোন জবাব দিবার পূর্ব্বেই মেনকা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "বেশ করেছ, মেরেছে। গুণের নিধি ছেলে বই-খাতা চুরি ক'রে সিগ্রেট ধরেছেন।....বিদ্যে শিখছেন !"

শিশিব উচ্চকণ্ঠে কহিল, "তাই ব'লে এমনি ক'রে মারে ? ছোঁড়াটাকে সারাদিন না খেতে দিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছে, যেন তাঁদেরই বাবার বাড়ি ?"

দারুণ অপমানে মেনকার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে-ও উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, "বেরো বল্‌ছি আমার সুমুখ থেকে, হতভাগা কোথাকার ! যেমন গোল্লায় গেছিস আপনি, তেমনি গোল্লায় দিবি সব্বাইকে ! মুখের আটঘাট নেই।"

শিশির উঠান হইতে একগাছা মোটা সজিনার ডাল তুলিয়া লইয়া কহিল, "বটে। আমি দূর হব ? দেখি কে কাকে দূর করে ?"

অরুণ বাহির হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইলেন মা—স্থির-গম্ভীর প্রতিমার মত।

এবার তিনি কথা কহিলেন, "শিশির চুপ কর্ বলছি, নইলে আমাকেই এর ব্যবস্থা ক'রতে হবে।"

স্বল্পভাষিণী জননীর মুখে এমন দৃঢ়শাসনের স্বর শিশির জন্মাবধি শোনে নাই। সে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে উত্তপ্ত স্বরে কহিল, "কি ব্যবস্থা ক'রবে শুনি ? বাড়ি ঢুক্‌তে দেবে না ?"

জননী দৃঢ়গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তাই। তোমরা জান না বাড়ি আমার নামে, জমিও আমার নামে। আমি ইচ্ছে ক'রলে—"

শিশির বলিল, "বেশ তোমার জমি বাড়ি বুকে ক'রে তুমি প'ড়ে

থাক। আর যদি এ-বাড়িতে পা দিই ত আমার অতিবড় দিব্যি রইল। একেও আমি নিয়ে চল্লুম। তোমাদের মার খেয়ে ও এখানে থাক্‌তে পারবে না। যাত্রার দলে গেলে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে।

বিমলকে লইয়া শিশির চলিয়া গেল।

অরুণ দেখিল মায়ের দুটি চক্ষে অশ্রুর ধারা বহিতেছে। নিষ্পলক নয়ন মেলিয়া তিনি পুত্রের গমন-পথের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন।

সে কহিল, "মা, মেজদাকে ডাকি।"

মা ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইলেন।

মেনকা বলিল, "কিন্তু মা, বিমলটার মাথাও যে খাবে, হতভাগা।"

মা বলিলেন, "অনেক দিনই ও নিজের মাথা নিজে খেয়েছে, যাক্। তোরা খেয়ে নিগে যা।" বলিয়া তিনি আপন শয়নকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাত্রিতে মেনকা ডাকিল, "মা, ওমা, ওঠ। একটু জল খাও।"

মা বলিলেন, "তুই খেয়ে আয় বাছা, আমি আজ আর খাব না।"

মেনকা মায়ের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, "তবে আমিও খাব না। ওমা! একি সব বালিশটা যে ভিজে গেছে! মা তুমি কাঁদ্‌ছিলে!"

মেনকার হাত দু'খানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া মা বলিলেন, "নাড়ীর যে ওষুধ নেই, মা। স্নেহ অন্ধ, ভাল মন্দ সে বিচার করে না।" বলিতে বলিতে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

২

কলিকাতার এক অপরিসর সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় গলির একটা জীর্ণ পুরাতন বাড়িতে কয়েকজন সমঅবস্থাপন্ন ভদ্রলোক মিলিয়া মেস প্রতিষ্ঠা

করিয়াছেন। চূণ-বালি-খসা—খোয়া-ওঠা, দোর-জানালা ভাঙা বাড়িটিকে দেখিলে বহুদিনকার পরিত্যক্ত জনহীন পুরী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ভাল করিয়া ফুটিতে-না-ফুটিতে ইহার ধূমমলিন কক্ষগুলিতে মৃদু দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিয়া অদূরবর্ত্তী অন্ধকারকে মুখ ভ্যাংচায়। তাসের আড্ডা বা গান-বাজনার চর্চ্চাও নিয়মিত বসিয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে প্রবল অট্টহাস্যধ্বনি বায়ুপ্রবাহে পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া চলে। যেমন ধ্বংসের মধ্যে মৃত্যুর প্রবাহ কখনও অতি ক্ষীণ, কখনও বা উদ্দামবেগে অবিচ্ছিন্নভাবে বহিয়া যায়, তেমনি ইহারাও অর্দ্ধমৃত দুঃখকষ্ট-জর্জ্জরিত প্রাণে সাধ-আহ্লাদের স্রোত বহাইয়া পৃথিবীর হাসি আলো উপভোগ করিতে করিতে সেই মহান্ মৃত্যুর অভিমুখেই অগ্রসর হইতে থাকে।

কমলের এ হাসি-উল্লাস—এ আনন্দ-উচ্ছ্বাস ভাল লাগে না। এ যেন জীবনকে লইয়া এক ব্যঙ্গময় কাহিনীর সৃষ্টি। যাহারা সত্যকার হাসিতে পৃথিবীর বুকে নন্দনকাননের সৃষ্টি করিয়া, মোটরে চড়িয়া, বাগানে বেড়াইয়া, প্রমোদ-ভবনে করতালি দিয়া জীবনটাকে হাল্কা ফানুসের মত উড়াইয়া চলিতে থাকে, তাহাদের পাশে এ হাসিকে মনে হয় যেন রিক্ততার ব্যথা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, অন্তরের অভাব দৈন্য উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া ধনীর দুয়ারে কৃপাভিখারী কাঙালের মত সঙ্কুচিত কর মেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে।

কমল একটি মাদুর টানিয়া লইয়া আপনার ক্ষুদ্র কক্ষের খোলা জানালার ধারে শুইয়া পড়িয়া ভাবে, এ যাত্রার শেষ কোথায়? উচ্চ আকাঙ্ক্ষা—রঙীন আশা পাঠ্যাবস্থায় কত ভাবেই না কল্পনার পাখায় ভর করিয়া কোন্ সুদূরে উড়িয়া বেড়াইত, আজ ত্রিশ টাকা মাহিনার কর্ম্মের চাপে সে তাসের সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সুচারু জীবনযাত্রার আশাই

হইয়াছে আকাশ-স্বপ্ন—জীবনের সাধ-অহ্লাদ ত দূরের কথা। যেমন ওই বৃদ্ধ সুরেশবাবু ষাট টাকায় সকল আশার সমাপ্তি করিয়া পেন্‌সনের জন্য বসিয়া আছেন! যেমন ওই কুমুদবাবু, আশুবাবু পঞ্চাশ টাকার জন্য আজীবন চেষ্টা করিতেছেন! যেমন হরিশঙ্করবাবু পাঁচ টাকা মাহিনা বৃদ্ধির জন্য বাজার হইতে পটোল কুমড়া শসা বেগুন কিনিয়া দেশের বাগানের জিনিষ বলিয়া বড়বাবুর শ্রীচরণকমলে তৈলনিষেক করিতেছেন! তেমনি কঠিন মূল্য দিয়া কি তাহাকেও উন্নতি কিনিতে হইবে? হায় উন্নতি! পয়লা তারিখ আসিতে-না-আসিতে খাবারওয়ালা, পানওয়ালা, বিড়ি সিগারেটওয়ালা, চা ওয়ালা আসিয়া পাওনার জন্য হাত পাতিয়া দাঁড়ায়! আর দাঁড়ায় মোটা লাঠি হাতে দীর্ঘকায় কাবুলের অধিবাসী, আপিসের দ্বারবান বা আপিসেরই কোন সহকর্ম্মী, তখন ওই ষাট টাকা দেখিতে দেখিতে কর্পূরবিন্দুর মত কোথায় উবিয়া যায়। যে দীর্ঘ দিনগুলি, ক্ষুধার্ত্ত পুত্র-কন্যা মাতাপত্নীর গ্রাসাচ্ছাদনের নীরব আবেদন লইয়া মুখের পানে চাহিয়া থাকে, তাহার মিনতি পুরাইতে আবার ওই সব যমদূতের দুয়ারেই হাত পাতিতে হয়। সারাজীবন সমস্যার জাল বুনিয়া তাহারা সংসারে যে শান্তিনীড় রচনা করিতে চাহে, মৃত্যুর পর বংশপরম্পরায় সেই জাল উর্ণনাভের মত সূক্ষ্ম তন্তুতে দুশ্চেদ্য ঋণজালে জড়িত হইয়া বংশধরদের জন্য সেই একই দুঃখদৈন্য ও বিভীষিকা বিস্তার করিয়া দিনের দিন শান্তিকে মরীচিকার মতই দূরে দূরে সরাইয়া লয়।

কিন্তু কমলের আশ্চর্য্য বোধ হয়—পরেশের পানে চাহিয়া। তাহারই সম্মুখে বসিয়া কাজ সে করে, মাহিনা পায় ওই ত্রিশটি টাকা। সংসারে মাতা, পত্নী ও এক শিশুকন্যা বিদ্যমান। তথাপি ফিটফাট জামা কাপড় পরিয়া, মাথায় টেরি কাটিয়া, এসেন্স মাখিয়া বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গেই দিন কাটাইয়া দেয়। অনেক দিন সে তাহার পানে চাহিয়া ভাবিয়াছে,

একি সত্যিই তৃপ্তি না আর কিছু? এ আনন্দ, না দুঃখকে অবহেলা করিতে আনন্দের প্রকাশ?

পরেশ তাহাকে কতদিন ঠাট্টা করিয়াছে। বলিয়াছে, "জীবন শুধু উপভোগ করিয়া কাটাও, জগতে সুখই তাই।"

কমল তর্ক করিয়াছে, "বাড়িতে তোমার মা বৌ মেয়েকে উপোসী রেখেও স্ফূর্ত্তি আসে?"

পরেশ হাসিয়া বলিয়াছে, "সে যখন বাড়ি যাব তখন সেখানকার ভাবনা। তা বলে এখানে কেন দুঃখ করি?" একটু থামিয়া বলিয়াছে, 'আর মা বউ থাকলেই কি খুব মস্ত একটা মায়ার শেকলে মন প্রাণ বাঁধা থাকে? ওই ভাঙ্গা আরসীটার সামনে দাঁড়াও দেখি কমলবাবু, দেখবে, আদর করে ও তোমায় বুকে ফুটিয়ে তুলবে। আবার ওখান থেকে সরে এস দেখবে ওর বুকে এক তিলও ছায়া নেই। এমনি সংসার।"

কমল অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিয়াছে, "অকৃতজ্ঞেই এই কথা বলতে পারে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব যার আছে, সে কখনো মায়ের স্নেহে—"

বাধা দিয়া পরেশ বলিয়াছে, "অবিশ্বাস করে না, কেমন এই কথা ত? কিন্তু ঠিক বিশ্বাস অবিশ্বাসের নিক্তি যে আজও জগতে তৈরী হয়ে ওঠেনি, কমলবাবু, তাহলে দেখাতাম কোনখানে তার ব্যবহার কতটা অযৌক্তিক। অর্থের আশায় অনেকখানি স্নেহ ভালবাসা পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু ওই আরসীরই মত। যতক্ষণ সে হাতের মুঠোয় ততক্ষণ তার অনুভব। অপর্য্যাপ্ত স্নেহ ভালবাসা যার অক্ষয় কবচ, এ সব নাস্তিকের তর্ক তার হৃদয়ভেদ নাও করতে পারে।" বলিয়া উচ্চ হাস্য করিয়াছে।

কমল বুঝিয়াছে, সে উচ্চহাসির অন্তরালে একটি স্নেহবুভুক্ষু অন্তরের

অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস লুকানো। প্রীতির সম্পর্ক তাহার ছায়া স্পর্শ করে নাই বলিয়া মমতাকে সে স্বীকার করিতে চাহে না। তাই জীবনের সঞ্চয়কে একান্ত অবিশ্বাসে মূর্খের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া অপব্যয়ের আনন্দকে চরম জয়পত্র-স্বরূপ দুঃখময় ললাটে আঁকিয়া রাখিয়াছে। তাই কারণে অকারণে ভগ্ন মুকুরে ম্লান হাসিটুকু ফুটাইতে তাহার আগ্রহ অধিক।

পাশের ঘরে হরিশবাবুদের পাশার আসর ততক্ষণে সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। দান এবং আড়ির উচ্চ কলরবে মাঝে মাঝে ভগ্নগৃহের ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ কাহারও নাই। পাশার দানে জিৎবাজীটাই যেন সব চেয়ে বেশী কাম্য। জীবনের ক্ষেত্রে যার যতখানি অসাফল্য, এক্ষেত্রে তার উৎসাহ তত বেশী। মানুষ আশা করে যতখানি, নিরাশ হয় সেই পরিমাণে অনেক বেশী এবং ভুলিয়া থাকিবার জন্য নিতান্ত বাজে বিষয় লইয়া মাতিয়াও উঠে তত শীঘ্র!

পরেশ বেশবিন্যাস শেষ করিয়া কমলকে বলিল, "শুয়ে শুয়ে কি ভাবছ, কমলবাবু? বোধ হয় বুড়োদের খেলার কথা।"

কমল সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "এত রাত্রিতে বেরুবে না কি?"

মুচ্‌কি হাসিয়া পরেশ বলিল, "চাঁদনীরাত, একটু ঘুরে আসাই যাক্ না। হৈ হৈ হট্টগোল ভাল লাগে না। যাবে? চল না।"

কমল বলি "না।"

পরেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "কেন ঘৃণা হয়? কিন্তু সত্যি বল্‌ছি ভাই কমলবাবু, এ বড় ভাল নেশা। জীবনে অনেক দুঃখ কষ্টের হাত থেকে রেহাই দেয়।"

কমল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া অবজ্ঞাভরে

বলিল, "যার যাতে তৃপ্তি! দেনা ক'রে স্ফূর্ত্তি করার চেয়ে বিষ কিনে খাওয়া ঢের ভাল।"

পরেশ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, "বাহবা বাঃ! খাসা বলেছ, দেনা ক'রে খাওয়ার চেয়ে বিষ কিনে খাওয়া ঢের ভাল। বাঃ বাঃ চমৎকার! তাই ভেবেই ত এ পথ ধরেছি। তবে ত স্নো পয়জন, একটু একটু ক'রে সেই মহাপথেই এগিয়ে দেয়। দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে নয়, আমোদের মধ্যে দিয়ে।"

একটু থামিয়া বলিল, "জানি ভাই, আমাদের সর্ব্ব পথ বন্ধ। ভাল লেখাপড়া জানি না, মোটা মাইনের চাকরি মিল্‌বে না। বাবা পয়সা-কড়ি তালুক-মুলুকও কিছু রেখে যাননি, যাতে পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খেতে পারি। তবু যখন চলতে হবে, তখন ভারগ্রস্তের মত বুড়ো থুড়থুড়ো হয়ে মুখ ভার ক'রে দুঃখকষ্ট সয়ে কেন চল্‌বো? এমনি বেপরোয়া স্ফূর্ত্তিই ত চাই। চল, যাবে? একবারটি চল, দেখবে সত্যি স্ফূর্ত্তি হয় কি না!"

কমল বলিল, "দুঃখের মধ্যে যে সহিষ্ণুতা থাক্‌লে মানুষ মানুষের মত চল্‌তে পারে, তা তোমার নেই। অসংযত আনন্দকেই জীবনের সার লক্ষ্য করেছ, তাই বিষ গলায় ঢেলে ভাবছো সুধা খাচ্ছি। কিন্তু সংযমে যে আনন্দ—"

পরেশ বলিল, "রাখ বাজি। আমি হারতে প্রস্তুত আছি। সংযমে কি আনন্দ আমায় বুঝিয়ে দাও। বুঝিয়ে দাও মনুষ্যত্ব কোন্ পথে? আমি ভাল ছেলের মত তোমার হাতে মাসে মাসে ত্রিশটি টাকা এনে দেব। বুঝিয়ে দিতে পার?"

কমল প্রশ্ন করিল, "তোমার দেনা কত?"

হাসিয়া পরেশ বলিল, "সে আঙলের পর্ব্বে গুনে উঠ্‌তে পারবে না।

বুঝতেই ত পারচ....ত্রিশটি টাকা মাইনে। মেসের খরচ, বাবুগিরি স্ফূর্ত্তি তবু বাড়িতে আজও পর্য্যন্ত উপার্জ্জনের একটি পয়সা দিইনি। মাসকাবারে লম্বা লাঠি ঠুকে কাবুলী সেলাম জানায়, দারোয়ান হাত পাতে, সুরেশবাবু, সুবলবাবু খুচরা দু-চার আনার জন্য কত-না মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়ে দেন। উড়ে বেহারাটা পর্য্যন্ত সেদিন উড়্নিখানা ছিনিয়ে নিলে। তার ওপর পানওয়ালা, খাবারওয়ালা, বিড়ি-সিগারেটওয়ালা ত আছেই।”

সে পরম আনন্দে মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, “পারবে বন্ধু, আমায় টেনে তুলতে? বল ত বাজি রাখি. আজ থেকে মদ সিগারেট বাবুয়ানী, স্ফূর্ত্তি সব ছেড়ে দিচ্ছি।”

শুনিতে শুনিতে কমলের দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। এ যে নিরন্ধ্র অন্ধকারে গভীর পঙ্কে আকণ্ঠনিমজ্জিত রসাতলের যাত্রা!

কোন্ পল্লীর কুটীরচ্ছায়ে প্রতি প্রভাতে, প্রতি সন্ধ্যায় বেদনাময় আশা বুকে বহিয়া বৃদ্ধা মা, তরুণী ভার্য্যা ইহার উন্নতিশ্রী কামনা করিয়া ভগবানের চরণে ঐকান্তিকী প্রার্থনা জানায়! প্রতি নিঃশ্বাসে কি গভীর বিশ্বাসেই না মঙ্গলময়ের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন! কিন্তু হায়! মানুষের ক্ষুদ্র আশার বর্ত্তিকা কি অদৃষ্টের আকাশে চিরদিনই এমনি অনুজ্জ্বল! ভবিষ্যতের লেখা পাঠ করিবার আলোটুকুও তাহা হইতে নিঃসৃত হয় না!

কমলের চিন্তাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া পরেশ কহিল, “জানি, জানি আমি, তা কেউ পার্‌বে না। এস আমার সঙ্গে, দেখবে হাজার হাজার লোক এই আমোদটুকুকে আশ্রয় ক’রে বেঁচে আছে। তারা দরিদ্র, তারা রিক্ত, তাই আমোদও তাদের এমন অপর্য্যাপ্ত। আরে ছ্যাঃ, তুমি যে ভাবতেই লাগলে? থাক তবে।” বলিয়া কোণ

হইতে ছড়ি লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে শিস্ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল।

পাশের ঘর হইতে হরিবাবু হাঁকিলেন, "কে যায়? পরেশ বুঝি? ছোঁড়া একেবারে গোল্লায় গেছে। চল্লেন রাত দুপুরে এখন নটীর বাড়ি একটু লজ্জা-সরমও নেই গা।"

শঙ্কর বাবু হাঁকিলেন, "ছ তিন নয়. ছ তিন নয়? এই ছ তিন নয়।" তার পরেই উচ্চহাস্যের রোল উঠিল।

৩

দুঃখের মধ্য দিয়াই দুটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কমলের ভগ্নমেসে পূর্ব্ব ব্যবস্থাই বহাল আছে। পুরাতন দু-একজন গিয়াছে, নূতন কেহ বা আসিয়াছে, কিন্তু সকলের অদৃষ্টই একসূত্রে গাঁথা। সেই অভাব-অনটন, দেনা কর্জ্জ, একঘেয়ে দুঃখ-ক্লেশের ইতিহাস শুনিতে শুনিতে মনে হয়, বাছিয়া বাছিয়া বিধাতা ভারতবর্ষের মাটিতেই ইহাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন জীবনভোর যন্ত্রণা সহিবার জন্য।

পরেশ তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। মেসে নামমাত্র সিট আছে, কোথায় থাকে, কি করে, কোন ঠিকানা নাই। মাঝে মাঝে বাড়ি হইতে মায়ের মিনতিভরা পত্র আসে এবং ভাঙা টিনের তোরঙ্গটার এক পাশে শুধুই আবর্জ্জনার স্তূপে জমা হইয়া উঠে। পরেশ হয় ত জানে না তার সব কথানির কথা। হাসিয়া বলে, "জানি সব। আমার সুখকেন্দ্রে খোঁচা দেবার জন্য ওতে দুঃখের বিষাক্ত তীর লুকিয়ে আছে, তাই পড়তে ভয় হয়।"

কমলের মাও চিঠি দেন। তাহাতে দুঃখকষ্টের নামমাত্রও থাকে না! থাকে শুধু প্রবাসী পুত্রের কুশল-কামনা, স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ, আর সাবধানে থাকিবার স্নেহ-সতর্ক উপদেশ।

বাড়ি গিয়া সে স্বচক্ষে সেখানকার অভাব দেখিয়া যদি অনুযোগ করে, 'হাঁ মা, তোমার কাপড় যে ছিঁড়ে গেছে, একথা লেখনি কেন? মা হাসিয়া বলেন, 'পাগল ছেলে। এখনও ছ মাস চল্‌বে ওতে। আরও একখানা তোলা আছে, পরি না।'

কিন্তু সেই কাপড়খানি চিরকালই বাক্সবন্দী হইয়া থাকে এবং মাও পুত্রকে নিঃশঙ্ক করিবার জন্য হাসিমুখে প্রতিবারেই ওই কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন।

সেদিন কিন্তু একখানি পত্রে দিদি অন্যান্য কথার পর লিখিয়াছেন:

তোমার বোধ হয় মনে আছে, অরুণ এবার ম্যাট্রিক দেবে। সেজন্য ফীয়ের টাকা জমা দিতে হবে। মা ভেবেছিলেন একথা তোমায় জানাবেন না, তাঁর একখানা গহনা বন্ধক দিয়ে টাকাটার যোগাড় ক'রবেন। কিন্তু ভাই, এমনি অদৃষ্ট সিন্দুক খুলে দেখা গেল, চার-পাঁচ-খানা গহনার মধ্যে একখানাও নেই। মা বুঝ্‌তে পারলেন—কার কাজ এ! কিন্তু উপায় ত নেই। কাজেই বল্‌লেন, কমলকে আর লিখিস্ না কিছু, ঘটীবাটি বাঁধা দিয়ে টাকা কটার যোগাড় কর্। কিন্তু ভাই, তুমি আমাদের উপার্জ্জনক্ষম অভিভাবক; তোমায় না জানানো আমার মতে ভাল নয়, তাই লিখ্‌লাম। যদি কোন রকমে যোগাড় কর্‌তে পার, ভালই, নইলে ঘটীবাটি ত আছেই।

তারপর কুশল প্রশ্নে আশীর্ব্বাদে পত্রের সমাপ্তি। কমল ভাবিতে ভাবিতে আপিস চলিয়া গেল।

মেসের সকলের অবস্থাই সমান। আপিসে টাকা কটা মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু অতিরিক্ত হারে সুদ দিয়া আসল ঋণ ত কোন-কালে শোধ করিতে পারিবে না? তবে উপায়?

একমাত্র উপায় বরানগরের মেজদি। তিনি যদি কিছু সাহায্য

করেন। কিন্তু সাত বৎসরের মধ্যে আজ সর্ব্বপ্রথম সেখানে হাত পাতিতে যাওয়া বড়ই বিসদৃশ ঠেকিল। পিতার মৃত্যুতে সেই অপ্রীতিকর ব্যবহারটাও মনের মাঝে উঁকি মারিল।

আবার ভাবিল, তাঁরা যাই বলুন না কেন, দিদি ত আমার। ভায়ের দুঃখকষ্ট দেখিলে কোন্ বোন স্থির থাকিতে পারে? যদিও কুটুম্বের নিকট অপমানিত হইতে পারি; আর অপমানই বা কিসের? কন্যাদান করিলেই পদে পদে নতি স্বীকার করিতে হয়। ভাইটিকে মানুষ করিবার জন্য এটুকু তাহাকে অম্লানবদনে সহিতে হইবে।

আপিসের ফেরৎ সে বরানগর চলিল।

* * * *

ঠিক বড়লোক বলা চলে না, অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। দ্বিতল বাড়িখানি অধিবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিতেছে।

কমল একটু ইতস্তত করিয়া দ্বারের কড়া নাড়িয়া ডাকিল, "কে আছেন?"

একটি তের—চৌদ্দ বছরের ছেলে দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকে চান?'

কমল বলিল "আমার বাড়ি অভয়পুরে।"

ছেলেটি একটু বিরক্ত হইয়া কহিল, "কিন্তু চান কাকে?"

কমল মেজদিদির নাম করিতেই দুয়ার বন্ধ করিয়া ছেলেটি ভিতরে চলিয়া গেল এবং উচ্চকণ্ঠে কাহাকে বলিল, "ও দিদি, অভয়পুর থেকে কে এসেছে, বৌদির নাম করছে। কিন্তু এমন ময়লা জামাকাপড়!"

স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর হইল, "বৌয়ের ভাই নয় ত? ডেকে বসা বাইরের ঘরে। এতকাল পরে আবার আদর কাড়াতে এলেন কেন, কে জানে!"

কমলের ইচ্ছা হইল এই মুহূর্তে ফিরিয়া যায়, কিন্তু ভাইয়ের জন্য পারিল না। আবার দীর্ঘদিন পরে যদি দিদির আশ্রয়ে আসিয়াছে ত তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা না করিয়া কি করিয়াই বা ফিরিয়া যাইবে? ইহারা হাজার অপমান করুক, নিরপরাধিনী দিদি ত তাহার কোন দোষ করেন নাই।

উষা আসিতেই কমল তাহাকে প্রণাম করিল।

সে কোন আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ না করিয়া ভায়ের ছিন্ন-মলিন বেশ ও রুক্ষ শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "কুটুমবাড়ি একটু ফরসা জামা-কাপড় পরে আসতে হয়, তোর এ জ্ঞানটুকু আজও হ'ল না, কমল।"

দীর্ঘ সাত বৎসর পরে প্রথম দর্শনে স্নেহময়ী ভগ্নীর এ কি নীরস তিক্ত সম্বোধন!

কমল আপনাকে অতি কষ্টে সংবরণ করিয়া আরক্ত নতমুখে উত্তর দিল, "তিরিশ টাকা মাইনের কেরাণীর কাছে এর চেয়ে বেশী আশা করা ভুল, মেজদি। আর কি বাবা আছেন!" বলিয়া মলিন জামার প্রান্তটা তুলিয়া চোখে দিল।

দিদি বেশ সহজ প্রশান্ত কণ্ঠে কহিল, "বুঝলুম অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে; কিন্তু হঠাৎ আজ কি মনে ক'রে এখানে?"

কমল রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি কেবল ভাবছি, সত্যিই তুমি আমার সেই মেজদি, না আর কেউ?"

দেওয়ালের পানে মুখ ফিরাইয়া কঠিন কণ্ঠে উষা বলিল, "সে সম্পর্ক ত তোমরাই চুকিয়ে দিয়েছ। সামান্য একখানা গহনার জন্য আজ সাত বছর ধরে এখানে পড়ে আছি। বাপ-মার যেন আরও ছেলেমেয়ে আছে, কিন্তু আমার—" আর সে বলিতে পারিল না। তেমনি মুখ ফিরাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কমল বুঝিল মেজদি কাঁদিতেছেন। সাত বৎসরের সঞ্চিত গোপন অশ্রু আজ সকল বাধা ঠেলিয়া মুক্ত অভিমানের সঙ্গে অবিরলধারে বহিতেছে। সে-ও কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে উষা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "এদের দেওয়া জ্বালা-যন্ত্রণা ত আমার অঙ্গের আভরণ হয়েছে; কিন্তু তোরাও যদি এমন নিষ্ঠুর হ'য়ে থাকবি ত যাই কোথায়? হাঁ রে কমল, মা কি আমার কথা একবারও বলেন না? ছোট ভাইগুলো—তাদের মেজদির কথা জিজ্ঞেস করে না? রমা শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কেমন আছে? বাবা নিশ্চয়ই আমার কথা—"

নেপথ্য হইতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের শব্দ আসিল, "উনুন যে খাঁ খাঁ ক'রে জ্বলে যাচ্ছে, গেল কোন্ চুলোয়?"

উষা ত্রস্ত হইয়া কহিল, "শুন্‌লি ত কমল! আমার জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, আছে কেবল কাজ—কাজ। তার পুরস্কার ওই গালমন্দ। হা,—তা কি মনে ক'রে এসেছিস?"

কমল আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিল। শুনিতে শুনিতে উষা কতবার অঞ্চলের প্রান্তে চক্ষু মুছিল।

কথা শেষ করিয়া কমল বলিল, "এখন উপায় তুমি, গোটা-চল্লিশ টাকা আমায় জোগাড় করে দিতে পার না মেজদি?"

উষা বিবর্ণ মুখে কহিল, "আমার ত এক পয়সাও নেই, ভাই। না,—না, আমি কোথায় পাব?"

কমল বলিল, "জামাইবাবুকে ব'লে।"

ম্লান হাসিয়া উষা পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল ও পিঠের কাপড় তুলিয়া দেখাইল। পরে ফিরিয়া হাসিমুখে কহিল, "এ ছাড়া আর কিছু আমি তার কাছে পাই না, ভাই।"

কমল শিহরিয়া বিস্ময়ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "সে তোমাকে মারে, মেজদি? পশু কোথাকার—"

"চুপ চুপ....দোর-জান্‌লারও কান আছে। এক কথা কমল, আমার মাথার কাঁটা দুটো খুলে দিই, জামার পকেটে ক'রে লুকিয়ে নিয়ে যা। বাড়ি গিয়ে বিক্রী করে টাকাটা নিস্।" বলিয়া মাথা হইতে সোনার কাঁটা দুটি খুলিয়া কমলের হাতে দিতে গেল।

কমল হাত সরাইয়া বলিল, "তারপর, তোমার দশা—মেজদি?"

ঊষা হাসিয়া বলিল, "সে ভাবনা তোর নয়। তুই নে শীগ্‌গির, কেউ দেখে ফেল্‌তে পারে!"

কমল নত হইয়া তাহার পায়ের ধূলা লইতে লইতে বলিল, "না মেজদি, ও তুমি রাখ। শুধু আশীর্ব্বাদ কর আমাদের, যেন একদিন চাকরিতে উন্নতি ক'রে তোমায় মার কোলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।"

পরম আগ্রহে তাহার হাত দুখানি ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে ঊষা বলিল, "পার্‌বি—পার্‌বি, কমল, একবার আমায় নিয়ে যেতে? আঃ, আমি সেই আশায় সব কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করবো, ভাই। কিন্তু যা শুনে গেলি—দেখে গেলি—এসব কথা মাকে জানাস্ নে ভাই।"

না"। বলিয়া কমল ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিল।

পথে যাইতে যাইতে সে শুনিল সেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ঝঙ্কার, "আক্কেলখাগীর কি একটুও আক্কেল নেই মা। কুটুমের ছেলে এলো—জলটুকু না খাইয়ে বিদেয় কর্‌লি। এমনি ক'রেই কি লোকের কাছে আমাদের মাথা হেঁট করাতে হয়!"

* * *

শনিবার দিন বাড়ি আসিয়া কমল সর্ব্বপ্রথম দিদিকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল, "টাকার ত কোন যোগাড় ক'রে উঠতে পারলুম না, দিদি! ঘটীবাটি বাঁধা দেওয়ার যোগাড় কর।"

মেনকা বলিল, "সেজন্যে তোর ভাবনা নেই, টাকা পাওয়া গেছে।"

কমল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় পেলে?"

মেনকা নিম্নকণ্ঠে কহিল, "রমার শ্বশুর সেদিন রমাকে এখানে রেখে গেছেন। তার আঁতুর খরচের জন্য একশো টাকা দিয়েছেন—তাই থেকে—"

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সে হয় না, দিদি। তাঁদের টাকা থেকে না ব'লে ক'য়ে নেওয়া আমার ত মত নয়।"

মেনকা বলিল, "সে যা হয় আমি করবো, তোকে কিছু ভাবতে হবে না। টাকার জন্যে বরানগর গিছ্‌লি না কি?"

কমল ঘাড় নাড়িল।

মেনকা আগ্রহভরে বলিল, "উষাকে কেমন দেখ্‌লি? সে আমাদের কথা কি বল্‌লে?"

"সে অনেক কথা দিদি। চুপি চুপি আর এক সময় বলবো। তবে এটুকু জেনে রেখো—বড় কষ্টেই তার দিন কাট্‌ছে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মেনকা বলিল, "তা আমি জানি। বাংলা দেশে মেয়ে হয়ে জন্মানো—শুধু দুঃখকষ্ট সইতে।"

রমা আসিয়া কমলকে প্রণাম করিল।

কমল তাহার মাথায় হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছিস্ ত?"

রমা বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু তুমি বিশ্রী রোগা আর ঢেঙা হ'য়ে গেছ বড়-দা! আপিসের খাটুনি খুব বেশী বুঝি?"

কমল হাসিয়া বলিল, “হ্যাঁ। আয় মার কাছে গিয়ে বসে বসে গল্প করিগে—চল্।”

৪

বর্ষার প্রারম্ভ। ম্যালেরিয়ায় সারা পল্লী ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রতিবারই অল্পবিস্তর লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। লেপ-কাঁথা চাপা দিয়া কয়েক ঘণ্টা প্রবল জ্বরের পীড়ন সহ্য করে; জ্বর ছাড়িলে নাওয়া-খাওয়া করিয়া প্রতিবেশীর বাড়ি গল্পগাছা করিতে যায়। নিত্য সহচরের মত বলিয়া জ্বরকে ততটা ভীষণ বোধ হয় না।

এবার ম্যালেরিয়া সারা পল্লী ব্যাপিয়া প্রবল প্লাবনের মত আসিয়াছিল। কে কাহাব মুখে জল দেয়, কে কাহার তত্ত্ব লয়! বাটি বাটি শিউলি পাতার রস, ফাইল-ভর্ত্তি কুইনিন উপহার দিয়াও জ্বরকে দেশত্যাগী করা গেল না। সে যেন চায় আরও কিছু বেশী।

মেনকা ছাড়া এ বাড়িতে কেহই ম্যালেরিয়ার কৃপা লাভে বঞ্চিত হয় নাই। সকলেই উঠিতেছে, পড়িতেছে এবং উঠা-পড়ার ফাঁকে নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম্মও করিতেছে। সকলেই জানে, যেজন্য মশার অত্যাচার সহিতে হয়, দারিদ্র্যের দুঃখ বহিতে হয়, মৃত্যুর আতঙ্কে শিহরিতে হয়, ইহাও সেই অদেখা অদৃষ্টের এক নিষ্ঠুর খেলা মাত্র! ইহা নিয়তির একটা রূপ। জন্মের সঙ্গে মানুষের ভাগ্যগ্রহে আশ্রয়লাভ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে অন্ধ নির্দ্দেশে তাহাকে অনির্দ্দিষ্ট মহাপথের অভিমুখে পরিচালিত করিতেছে। এ পথের যাত্রা ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় মানুষ প্রতিরোধ করিতে পারে না; রোগ আলস্য দৌর্ব্বল্য কিছুরই দোহাই মানে না, অর্থসম্পদেও ইহার স্রোত ফিরান যায় না। ইহা নিয়তি।

ছোট খুকী উমা বার-বার রোগের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না।

ক্ষুদ্র প্রাণে আর কতই বা সহ্য হয়! একদিন প্রভাতে প্রবল জ্বরে কাঁথা মুড়ি দিয়া শয্যাশ্রয় করিল। মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণ ও সারারাত্রি চলিয়া গিয়া আবার প্রভাত ফিরিয়া আসিল, প্রবল জ্বরের এতটুকু হ্রাস হইল না।

মেনকা ভীত হইয়া মাতাকে বলিল, "এ ত ম্যালেরিয়া নয় মা। চব্বিশ ঘণ্টা জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, ভুল বক্‌ছে। একজন ডাক্তার ডাকি না হয়।"

মারও তখন সবেমাত্র শীত শীত করিয়া জ্বর আসিতেছে। একখানা কাঁথা টানিয়া লইয়া খুকীর পাশে শুইয়া পড়িয়া ক্লিষ্টস্বরে বলিলেন, "ডাক্তার ডাকবার পয়সা কোথায় পাবি মিনি! পারিস ত ডাক, আমার বাছার মুখে এক ফোঁটা ওষুধ দে। দেখিস্ যেন দুঃখিনী মার কাছে এসেছিল ব'লে মা আমার অভিমান ক'রে চলে না যায়! উমা, উমা, মা আমার—", বলিয়া তিনি অচৈতন্য কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মেনকা চক্ষু মুছিয়া অরুণকে বলিল, "ঈশানকে ডেকে নিয়ে আয় অরু।"

ডাক্তার আসিলেন। বাহুমূল ফুঁড়িয়া ঔষধ দিলেন, বুকে মালিশ করিবার মলম দিলেন এবং ভয়-অভয় দুটি জিনিষেরই অস্তিত্ব জানাইয়া আসন্ন বিপদকে ঘনীভূত করিয়া বিদায় লইলেন।

নিয়তি।

গোধূলির পবিত্রলগ্নে অস্ফুট শুভ্র যুঁই ফুলটি ফুটিবার পূর্ব্বেই বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িল। এখানকার খেলাঘরের সাজান সংসার রাখিয়া ছোট খুকী চিরদিনের জন্যই চলিয়া গেল।

মা চীৎকার করিয়া কাঁদিলেন না, আছাড়ি-পিছাড়িও করিলেন না, শুধু দুটি রোগতপ্ত বাহু দিয়া শিশুর শীর্ণ-শিথিল হিম দেহখানি

আঁকড়াইয়া ধরিয়া ভগ্নস্বরে কহিলেন, "ওরে না, না, আমার উমাকে আমি ছেড়ে দেব না, দেব না রে!"

মেনকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "একটু চুপ কর মা। ওই দেখ তোমায় কাঁদ্‌তে দেখে রমা কেমন করছে। অরুণ, অরুণ, শীগ্‌গির এদিকে আয়—রমার বোধ হয় ফিট হয়েছে।" মা অতি সন্তর্পণে উমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে শেষ চুম্বন আঁকিয়া দিলেন। পরে তাহাকে বুক হইতে নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

* * *

কমল এ সংবাদ পায় নাই। সে নিশ্চিন্তমনে নাকে-মুখে দুটি গুঁজিয়া আপিসে ছুটিত ও প্রতিনিয়ত ভাবিত, কি করিলে কোন্ উপায়ে অপর্য্যাপ্ত অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে কত-না অসম্ভাবিত উপায়ে কপর্দ্দকহীন ভিখারী অগাধ ধন-সম্পত্তি লাভ করিয়া সমাজের মধ্যে বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন। সে কৃতবিদ্য। কুহকবিদ্যা কিংবা সন্ন্যাসীর কৃপাদৃষ্টিকে বিশ্বাস করিত না। সে ভাবিত, অর্থের নিহিত তত্ত্ব শুধু ব্যবসায়েই আছে, তা সে ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ যাহাই হউক না কেন। চাকরিতে ভিক্ষা, কর্জ্জ, কষ্ট, এতো পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু সে দেখিয়াছে এবং বইয়েও পড়িয়াছে—সামান্য সূত্র ধরিয়া বাণিজ্য-লক্ষ্মী কত হতভাগ্য নিরন্নকে অর্থ দিয়াছেন, অন্ন দিয়াছেন, ভাগ্যশ্রী দিয়াছেন। এই কলির শেষযুগে বুঝি আর তাহা সম্ভব নহে। কথায় কথায় বিশ্বাসের অপব্যবহার যেখানে, সেখানে কোন্ ধনবান সরল মুখশ্রী দেখিয়া বা কর্ম্মপটু অন্তর চিনিয়া জীবনযুদ্ধের সহায়তা করিবেন? অর্থ সামান্য মাত্রও নাই, যে-সম্বলে একখানা পানের দোকানও খোলা যায়।

শ্যামবাবু বলেন, "লটারীর টিকিট কেন, ভাগ্য ফিরলেও ফিরতে পারে।"

কমল মনে মনে হাসিয়া ভাবে, তাহাই যদি হইবে ত আপিসের গোলামীতে সামান্য মাহিনায় বহাল হইবে কেন? ভাগ্য যদি সুপ্রসন্নই হইত ত অন্য উচ্চতর পদও ত মিলিতে পারিত কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধাও হয়ত হইত, কিন্তু সে কথা যাক্। ওই শ্যামবাবু আজ বিশ বছর ধরিয়া কত অর্থই না কত প্রকারের লটারীর টিকিটে অপব্যয় করিয়া আসিতেছেন, কোন দিন কাম্য ফল লাভ করিতে পারিয়াছেন কি? তবে কোন্ আশায়—

উত্তর তাঁহার হয়ত একটা ছিল, সে ওই ভাগ্য! আজীবনের ব্যর্থ চেষ্টা শেষ মহূর্তে সফল হইতে দেখা গিয়াছে। মানুষ আশার দাস। সুতরাং চেষ্টা হইতে বিরত হইও না। অনিলবাবু প্রতি শনিবার রেসে যান। তিনিও কতকটা ভাগ্যের উপর বরাত দিয়া অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চার ভরণপোষণ করেন। বাক্সেব টাকাকড়ি, স্ত্রীর অলঙ্কার, কলিকাতাব ক্ষুদ্র বাস্তুখানি পর্য্যন্ত এই হার-জিতের খেলায় বাজি ধরিয়াছেন, তবু তিনি আশা ছাড়েন নাই। ভাগ্য! কে জানে কোন্ মুহূর্তে ইহার স্রোত ফিরিয়া যায়! তিনিও কমলকে রেস খেলিতে উপদেশ দেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, নিশ্চিত জয় তাহার ভাগ্যে আনিয়া দিবেন।

কমলের আশালুব্ধ অন্তর মাঝে মাঝে চঞ্চল হইয়া উঠে। একবার রেসের টিকিট কিনিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতে ক্ষতি কি? কত লোকেই কত আশা বুকে বাঁধিয়া শনিবার দ্বিপ্রহরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ওই মাঠের উদ্দেশেই ছুটে! তাহাদের মধ্যে দীনতম ভিখারী হইতে ক্রোরপতি পর্য্যন্ত সকলেই আছেন। ব্যর্থকাম হইলে কেহ কি ওখানে যাইত?

মনে হয় ভাগ্য বলিয়া একটা প্রবল সূত্র কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে প্রসারিত রহিয়াছে, যাহার পলকের ইঙ্গিতে সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার অভিনয় হয়। মনে হয়, জ্ঞানের অতীত, বিদ্যার অনায়ত্ত, বুদ্ধির অনধিগম্য সে ভাগ্য ; উদ্যম ও কর্ম্মের উপরও তাহার প্রভাব বিস্তৃত। এই ভাগ্যই তাহাকে দুঃখের অনলপরীক্ষায় টানিয়া আনিয়াছে, চেষ্টা করিয়া ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

শনিবার দিন সে অনিলবাবুকে বলিল, "আমায় নিয়ে যাবেন রেস কোর্সে ?"

অনিলবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, "তুমি যাবে ? হুর্‌রে—বেশ, বেশ ! এতদিনে বুদ্ধি হয়েছে দেখ্‌ছি। শিউর টিপ, আজ যদি পকেট ভর্ত্তি না করিয়ে দিই, চল, চল।"

পকেট ভর্ত্তি না হউক বাড়ি ফিরিবার মুখে টাকা গনিয়া দেখা গেল ত্রিশটি টাকা লাভ হইয়াছে। এক মাসের মাহিনা।

অনিলবাবু সোল্লাসে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "ভারী লাকি চ্যাপ ত তুমি ! বেশ বেশ—এমনি ত চাই। আবার আস্‌ছ ত শনিবারে ?"

কমল বিষণ্ণ মুখে জবাব দিল, "না"।

"কেন, কেন ?"

কমল বলিল, "যা দেখে গেলুম এখানে, সে শিক্ষা আমি জীবনে ভুল্‌ব না। এও একটা নেশা। অন্যান্য কু-নেশার মত মানুষের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রে দেয়। জোচ্চোরি !"

অনিলবাবু হাসিলেন। বলিলেন, "ছোকরা, এই নিয়ে দুনিয়া চল্‌ছে। তোমার গলায় ছুরি চালিয়ে আমি পকেট ভর্ত্তি কর্‌ছি, আবার আমায় ঠকিয়ে তুমি সংসার চালাচ্ছ ! যে বেশী নিরীহ, সংসারে ক্ষত বিক্ষত

হয় সে-ই বেশী। ভেবে দেখ দেখি—জোচ্চোর কে নয়? পৃথিবী জুড়ে মারামারি, কাটাকাটি শুধু এই জোচ্চোরির খেলা। মনটাকে শক্ত কর, ছোকরা, শক্ত কর, নইলে কঠিন সংসার, এক তিলও টিকে থাক্‌তে পারবে না।"

কমল বলিল, "আমরা জাত-হিসেবে এত ছোট কেন জানেন? শুধু গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলি ব'লে। আয়ের চেষ্টা এমনি ফাঁকি দিয়ে করি, রাতারাতি বড়লোক হ'য়ে সব দুঃখ দূর কর্‌তে চাই, তাই এ অধঃপতন। এই ফাঁকি দিয়ে বুদ্ধিমান্ হবার, লাভ করবার চেষ্টাই আমাদের অসাধু অবিশ্বাসী ক'রে তুলেছে, অনিলবাবু।"

সাম্‌নেই বাসওয়ালা হাঁকিতেছিল, "শ্যামবাজার, বাবু, শ্যামবাজার।"

অনিলবাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন, "গোটা-দুই টাকা দাও ত ধার কালই দেব। রোগা ছেলের দুটো বেদানা, ময়দা, চিনিও বোধ হয় ফুরিয়েছে, কিন্‌তে হবে। আর দেখ না বাসভাড়া এখান থেকে বরানগর—"

কমল তাঁহার হাতে দুটি টাকা দিয়া সাগ্রহে কহিল, "আপনি বরানগরে থাকেন? একটা খবর দিতে পারেন?"

অনিলবাবু ততক্ষণে বাসে উঠিয়া বসিয়াছেন। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "কিসের খবর?"

"শশধর বাঁড়ুয্যেদের বাড়ির সকলে কেমন আছেন?"

"সে আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূর। আচ্ছা, কাল সকালে জেনে এসে ব'লবো। গুড্‌নাইট।"

"গুড্‌নাইট।"

পরদিন অনিলবাবু আপিসে আসিতেই কমল বরানগরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল।

অনিলবাবু বলিলেন, "তাঁরা সকলেই ভাল আছেন। বাড়িতে দেখ্‌লুম সামিয়ানা টাঙানো হ'য়েছে, শুনলুম—বে।"

কমল বলিল, "বিয়ে! কার বিয়ে?"

অনিলবাবু বলিলেন, "শুন্‌লুম ত বড়ছেলের। পরশু গায়ে হলুদ হ'য়ে গেছে। হাঁ, এবার দ্বিতীয় পক্ষ। তবে ওদের বাড়ির একটা বিশেষ বদনাম শুনে এলুম।"

কমলের মুখে আর প্রশ্ন করিবার ভাষা যোগাইল না। সে চিত্রার্পিতের মত অনিলবাবুর পানে চাহিয়া রহিল।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওরা বউকে না কি জ্বালা-যন্ত্রণা দেয় খুব। প্রথম পক্ষেরটিকে বিয়ে ক'রে এনে অবধি বাপের বাড়ি পাঠায় নি। কর্ত্তা, গিন্নী এমন কি ছোট ছেলেটা পর্য্যন্ত গাল দিয়ে বেত মেরে বৌটির সারা দেহে কালশিটে পাড়িয়ে দিয়েছিল। ভগবান তাকে শান্তি দিয়েছেন, বৌটি মরে জুড়িয়েছে।"

কমলের চোখের সামনে দপ্ করিয়া মুহূর্ত্তে পৃথিবীর আলো নিভিয়া গেল। পায়ের তলায় যেন ঘরের মেঝেটা কাঁপিয়া উঠিল এবং অবলুপ্ত চৈতন্যের মধ্যে শুধু একটি করুণ ক্রন্দনের রেশ আসিয়া কানে বাজিতে লাগিল, "আমায় নিয়ে যাবি ত ভাই, নিয়ে যাবি ত?"

তারপর, জ্ঞান যখন ফিরিয়া আসিল, তখন কমল একা। সেই ভগ্ন মেসের ক্ষুদ্র গৃহে মলিন শয্যায় শুইয়া আছে। শরীর অবসন্ন—মস্তকে দারুণ যন্ত্রণা, সমস্ত অঙ্গ দুঃসহ বেদনায় টন্ টন্ করিতেছে! পাশের ঘরে প্রতিদিনকার কলরব তেমনি উদ্দাম। পরেশ হয়ত নিত্যকার অভ্যাসমত দুঃখ ভুলিতে বাহির হইয়াছে।

অবহেলিত রোগজর্জ্জরিত সে পড়িয়া আছে সুস্থ জগতের বাহিরে, এই ক্ষুদ্র কক্ষই যেন তার সত্যকার বিশ্রামস্থল।

কে একজন কক্ষদ্বারে উঁকি মারিলেন এবং মোটা গলায় বলিলেন, "কেমন আছ কমলবাবু?"

কমল কি বলিতে গেল—স্বর বাহির হইল না।

লোকটি চৌকাঠের উপর এক পা রাখিয়া সন্তর্পণে একটু ঝুঁকিয়া বলিলেন, "মুখে যেন সব কি বেরিয়েছে? সব গায়ে কি খুব ব্যথা?"

কমল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।"

লোকটি দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "তবেই হয়েছে! মার অনুগ্রহ! আমি তখনই বলেছিলাম—", বলিয়া আর ক্ষণমাত্র সেখানে না দাঁড়াইয়া অপর কক্ষে ক্রীড়ারত লোকগুলিকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "অ মশাই কালীবাবু, শুন্‌ছেন কুমুদবাবু, ওহে ক্ষেত্তর—আর ত এ মেসে থাকা চলে না। কমলবাবুর মার অনুগ্রহ হয়েছে—এক্কেবারে স্মল পক্স। কই ম্যানেজার শঙ্করবাবু গেলেন কোথায়? তিনি এর যা হয় একটা বিহিত করুন।"

কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না, শঙ্কিত অন্তরে সকলেই বক্তার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ফটাস্ ফটাস্ চটি জুতার শব্দ করিতে করিতে শঙ্করবাবু ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন। কহিলেন, "ভূষণবাবু, এত চীৎকার করছেন কেন? হ'ল কি?"

ভূষণবাবু মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। দেখুন গে, ওই ঘরে গিয়ে কমলের অবস্থা।"

শঙ্করবাবু কমলের কক্ষের সম্মুখে আসিয়া ডাকিলেন, "কমলবাবু, কমলবাবু?"

আচ্ছন্নের মত কমল উত্তর দিল, "অ্যাঁ!"

শঙ্করবাবু বলিলেন, "শুন্‌ছেন,—আপনার পক্স হয়েছে দেখে মেসের

সবাই ভয় খেয়ে গেছেন। কাল সকালেই এখান থেকে বাড়ি চলে যাবেন, বুঝ্‌লেন? আর এখন সেখানে যাওয়াই আপনার উচিত। সেখানে মা আছেন, বোন আছেন, তাঁরা দেখ্‌তে শুনতে পারবেন। আপনার পক্ষেই ভাল।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে ছাদের উপর চলিয়া গেলেন।

অনেক রাত্রিতে পরেশ মেসে ফিরিল।

পার্শ্বের কক্ষে সকলেই তথন নিদ্রিত, শুধু কমল শয্যায় শুইয়া—'জল' 'জল' বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া কমলের অবস্থা দেখিয়া পরেশের নেশা কাটিয়া গেল! তাড়াতাড়ি কলসী হইতে এক গ্লাস জল ঢালিয়া রোগীর শিয়রে বসিয়া স্নেহভরা কণ্ঠে ডাকিল, "কমলবাবু।"

রক্তআঁখি মেলিয়া কমল হাঁ করিল ও একনিঃশ্বাসে অনেকখানি জল পান করিয়া ক্ষুদ্র একটি 'আঃ' বলিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

পরেশ তাহার মাথার মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বলিল, "জ্বরটা কি খুব বেশী হয়েছে? বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে?"

কমল ক্ষীণস্বরে বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এখানে থেক না ভাই, বড় ছোঁয়াচে রোগ।"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "সমুদ্রে যার শয্যা—শিশিরে তার কি ভয়। এ লক্ষ্মীছাড়ার জীবন গেলেই বা কি, আর থাকলেই বা কি? কমল, সংসারে যে স্নেহবঞ্চিত তার জীবনের আসক্তি খুব কমই জেনো।"

কমল তাহার হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি জান না ভাই, এই স্নেহই মানুষের অভেদ্য বর্ম্ম। ভাই পরেশ, আমায় একবার বাড়ি নিয়ে যেতে পার? আমার মার কাছে, ভাই বোনেদের কাছে?"

পরেশ বলিল "দেখি চেষ্টা করে।"

পরেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া ক্ষীণ আগ্রহোত্তেজিত কণ্ঠে কমল বলিল, "না—না ভাই, আমায় বাড়ি নিয়ে চল, নিয়ে চল। মার কোলে গিয়ে যেন শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারি। আমার মা, দুঃখিনী মা,—তাঁর পায়ের ধূলো মাখ্‌লে আমার গায়ের জ্বালা জুড়ুবে।"

পরেশ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "রাত্রি শেষ হোক, তোমায় যেমন করে পারি আমি মার কাছে নিয়ে যাবই। স্থির হও ভাই।"

কমল শ্রান্তিভরে পরম তৃপ্তিতে চক্ষু মুদিল।

৫

শ্মশানে চিতা তখনও নিবে নাই। রাত্রিশেষে প্রবল গর্জ্জন তুলিয়া বাতাস আসিয়াছিল, এখনও তাহার মন্দীভূত বেগ চিতার নির্ব্বাপিতপ্রায় অগ্নিরাশিকে উদ্দীপ্ত করিয়া রহিয়া রহিয়া মৃদু বিলাপধ্বনিতে শোঁ-শোঁ করিতেছিল। নদীতীরে বসিয়া সর্ব্বহারা অভাগিনী শূন্য দিগন্তের পানে চাহিয়া হয়ত শোকার্ত্ত প্রকৃতির ক্রন্দনই শুনিতেছিলেন। পায়ের তলায় অবিরাম কুলুধ্বনিতে নদী এই বিলাপ গাথাই গাহিতেছে, আকাশে পাংশু সূর্য্য মেঘের আড়ালে শোকমলিন, ওপারের ধূসর দিগন্তও যেন চিতা-ধূমের বাষ্পে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মাঠের পর মাঠ চলিয়াছে—তৃণশূন্য—শস্যশূন্য—বৃক্ষশূন্য।

শ্মশানের আশেপাশে খানিকটা জঙ্গল ও দুই চারিটা বাব্‌লা গাছ। তার চারিপাশে নরকঙ্কালের রাশি। ঝোপের মধ্যে দিনের বেলায় শৃগাল মাংসের লোভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কুকুর একটু দূরে একখানা হাড় লইয়া পরম আরামে চিবাইতেছে, গাছে বসিয়া বিকট কা-কা স্বরে কাক

ডাকিতেছে। মানব-জীবনের নশ্বরতা এখানে আসিলে যেমন উপলব্ধি হয় এমন আর কোথাও নহে।

মেনকা ডাকিল, "মা, ওঠ, বাড়ি চল।"

স্তব্ধ পাষাণমূর্ত্তির মতই মা একদৃষ্টে চিতার পানে চাহিয়া আছেন।

মেনকা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভগবানের কাছে আমরা কি অপরাধ করেছিলাম, মা, যে এত শাস্তি! উষা গেল, খুকী গেল, এক মাস যেতে না-যেতে রমাও আমাদের ছেড়ে গেল। আবার কমল—"

মা কাঁদিলেন না, পূর্ব্বের মতই চিতার পানে চাহিয়া রহিলেন। মেনকা বলিল, "দোহাই মা, তুমি একবার কাঁদ, একবার চেঁচিয়ে কাঁদ। আমি জানি তোমার কি ব্যথা! বুক ফেটে যাচ্ছে, একবার কাঁদ।"

মা মেনকার পানে চাহিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কাঁদতে যে আমি পারি না, মা। যেন দম আটকে আসছে। খুকীর খেলাঘর তেমনি পাতান আছে, সেদিকে চেয়ে চোখে জল আসে না। রমার ছেলের ছোট কাঁথা বালিশ জামা মোজা তাকের ওপর তোলা রয়েছে, সে সবও চেয়ে চেয়ে দেখি; উষা ত অনেকদিন আগেই সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে গেছে। আবার কমল—"

কথা শেষ না করিয়া তিনি চিতার পানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

পরেশ আসিয়া মাকে বলিল, "আমি জানতুম সংসারে অর্থই সব, সে ভুল আমার ভেঙেছে। স্নেহ যে কি অমূল্য জিনিষ, তা বুঝেছি। আমারও বাড়িতে মা আছেন, তিনিও প্রতি শনিবার আমার আশাপথ চেয়ে থাকেন। হয়ত কত ব্যথা পান—কত কাঁদেন। আগে ভাবতাম সে-সব মৌখিক। একদিন রাগ করে বলেছিলেন, "অতবড় ধাড়ী

ছেলে ঘরে বসে বসে খেতে লজ্জা করে না? সেই ঘা খেয়ে ঘর ছাড়ি—সেই অভিমানই বুকে পুষে রেখেছি। আজ বুঝেছি কতবড় ভুল করেছি। মা, কমল রোগশয্যায় শুয়ে কেবল বলেছিল, আমায় বাড়ি নিয়ে চল—বাড়ি নিয়ে চল, আমি মাকে দেখবো।"

অকস্মাৎ মা আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। যেন রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির দ্রবস্রোত প্রচণ্ড আলোড়নে সহসা ঊর্দ্ধে উঠিবার মুক্তিপথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

সে কি কান্না! নদীতীর প্রতিধ্বনিত করিয়া, দিগন্ত প্লাবিত করিয়া, আকাশ-বাতাস খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া যুগযুগান্ত-সঞ্চিত সে কি মর্ম্মভেদী বুকফাটা হাহাকার!

বায়স কা-কা স্বর ভুলিয়া গেল, শৃগাল বনপ্রান্তে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, সারমেয় চর্ব্বণরত হাড় ফেলিয়া মুখ তুলিল।

ক্রন্দনের তীব্র বেগ বাড়িতে লাগিল। যেন প্লাবনের মহাসিন্ধু কূলে অনন্ত তমিস্র রজনীতে লেলিহান চিতার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া স্নেহরূপা জননী ধরিত্রী সৃষ্টি-বিয়োগ-বেদনায় হাহাকারে দিগদিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছেন।........

* * * *

আবার সেই ভগ্নগৃহে ভগ্নসংসারে মা ফিরিয়া আসিয়াছেন। আবার দুটি বিধবা মিলিয়া তিনটি অপোগণ্ডের লালনপালনের ভার লইয়া পুরাতন শোক ভুলিতে বসিয়াছেন।

অরুণ দারিদ্র্যের প্রতিকার-মানসে গৃহত্যাগ করিয়াছে। মাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়া দিয়াছে, যদি সৌভাগ্যলক্ষ্মীর স্নেহস্পর্শ তার ভাগ্যে ঘটে, তবেই সে ফিরিবে, নতুবা এই যাত্রাই তার শেষ যাত্রা!

গ্রাসাচ্ছাদনের সম্বল সেই কয় বিঘা ধানের জমি—তাহাও বুঝি আর থাকে না। দশ-বারো বছরের ছেলে দুটি সর্ব্বদাই ম্রিয়মান হইয়া থাকে। কোলেরটি কিছুই বোঝে না, তেমনি হাসিয়া মার গলা জড়াইয়া ধরে, মুখে চুমা দেয়—খিল্ খিল্ করিয়া হাসে—কত দুষ্টামী করে। মাঝে মাঝে দাদা ও দিদির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মাকে ও দিদিকে কাঁদায়।

নিষ্ঠুর সংসার প্রাণপ্রিয়তম নাড়ী-ছেঁড়া ধন পুত্র-কন্যার শোকে কাঁদিবার অবসর দেয় না, প্রাণ ধারণের সমস্যা-জাল পাতিয়া সব ভুলাইয়া দেয়। তাই দিবসের কর্ম্মক্লান্ত দেহ যখন নিশীথের নিরালায় সর্ব্ব কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে, তখনই পুরাতন শোক নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে। তখনই মনে পড়ে তাহাদের স্নেহ-ভালবাসা, চাহনি চলন, কথা-বার্ত্তা, যাহারা চিরদিনের তরেই নয়নের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে।

একে একে ধানের জমি বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। ছেলেরা বড় হইতেছে, হয়ত মানুষ হইতেছে।

প্রতিবাসীরা পূর্ব্বের মতই দুঃখে সমবেদনা জানাইয়া বলে, এরাই তোমার সাত রাজার ধন সাগর-ছেঁচা মাণিক। মানুষ হ'য়ে উঠুক, সব দুঃখ ঘুচবে।

মা ভগবানের কাছে মনে মনে কামনা করেন, আমার সাধআহ্লাদ সবই ত তুমি জান, প্রভু! অনেক আশা করেছিলাম, অনেক দাগা খেয়েছি। আর কোন আশা রাখি না, শুধু এদের দুঃখ দূর হোক্।

তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় ষাট বৎসরের বৃদ্ধা। চুল সব পাকিয়া গিয়াছে, দাঁত পড়িয়াছে, গণ্ডের মাংস শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তেমন সোজা হইয়া চলিতেও পারেন না।

নদীতীরের ভগ্ন ঘাটের বহু পুরাতন ছিন্নশাখা দীর্ণকাণ্ড বট অশত্থ যেমন শতাব্দীর ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া সহস্র কদর্য্য শিকড়ে মাটি আঁকড়াইয়া

ধরিয়া প্রতিদিনকার তরুণ সূর্য্যকে নিশান্তের নতি জানাইয়া বলে, আমি আছি। তোমার প্রখর রৌদ্রের তাপে ক্লিষ্ট পথিককে যদিও আর পূর্ব্বের মত শীতল ছায়া বিলাইয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারি না, তবু জগতের মধ্যে নাম্নী হইয়া আছি। মাও তেমনি আছেন। ছোট খোকাকে সাহস করিয়া আদর করিতে পারেন না, বড়দের রুক্ষ মলিন মুখের পানে ফিরিয়াও চান না। কি জানি, তাঁহার সর্ব্বনাশা স্নেহের পথ ধরিয়া আবার যদি দুরন্ত শোক ফিরিয়া আসে? যদি ইহারাও তাঁহার স্নেহের অমর্য্যাদা করিয়া পথপ্রান্তে ফেলিয়া চলিয়া যায়?

এমনি করিয়া বছর ঘুরিয়া গেল, অরুণের কোন সংবাদই নাই। মেনকা নিত্য উৎকণ্ঠিতকণ্ঠে প্রশ্ন করে, "কি হ'ল মা অরুণের? সে ত তেমন ছেলে নয়। আজ বছরাবধি কোন খবর দিলে না!"

আশঙ্কায় মায়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠে। সেই ব্যগ্র প্রশ্নের চরম উত্তরই হয়ত ভগবান অন্তরীক্ষে বসিয়া তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছেন। বুকের আর একখানি অস্থি হয়ত খসিয়া পড়িবে।

মা অন্য কথা পাড়েন, "আর কটা দিন এমনি ক'রে কাটবে, মিনি! ঘটীবাটি থালাবাসন জমিজমা সবই ত শেষ হয়ে এল,—তারপর?"

মেনকা ম্লানমুখে বলিল, "রায়েদের ছোট গিন্নি পরশু ঘাটে বলছিলেন একজন রাঁধুনী চাই। বেশ বিশ্বাসী জানাশোনা লোক হ'লেই ভাল হয়। আমি ভাবছি—"

মা শান্তস্বরে বলিলেন, "ওদের বাড়ি রাঁধবি?"

তারপর কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমিও তাই ভাবছিলাম, এ ছাড়া আর পথ কি? দেখিস ত মা, আমারও যদি একটা—"

আর্ত্তস্বরে মেনকা বলিল, "মা মা, চুপ কর।"

মা ধীরস্বরে বলিলেন, "চম্‌কে উঠ্‌লি কেন মিনি? যে বাড়ির বউ —যে লোকের স্ত্রী আমি, সবই জানি। মান-সম্ভ্রম কিছুই ভুলিনি, মা। কিন্তু টাকার সঙ্গে যে সে-সব গেছে, মা। নইলে আমার মেয়ে হ'য়ে তুই আমারই মুখের ওপর একথা বল্‌লি কি ক'রে? ওরে তুই বুঝ্‌বি না—কমলকে হারিয়ে আমি যত না দুঃখ পেয়েছি, তোর এই কথা শুনে তার শতগুণ দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় কি? আমরা উপোস দিয়ে মরতে চাইলেও এ কাঁটাগুলো যে ছাড়ে না। এদের যে এখনও মানুষ করে তুল্‌তে হবে।"

মেনকা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গেল।

৬

বহুদিন পরে অরুণের পত্র আসিয়াছে।

সে লিখিয়াছে:

মা! আপনাদের নিষ্ঠুরের মত ছাড়িয়া আসিয়াছি। বৎসরাবধি পত্র দিই নাই, আমার এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—অর্থের জন্য মমতাকে বিসর্জ্জন দিব, দিয়াছিলামও তাই। এক বৎসর আপনাদের কোন সংবাদ লই নাই। আপনি হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন আমি আজ লক্ষপতি, অর্থের সীমা পরিসীমা আমার নাই। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে যে অপরাধ করিয়াছি—তার শাস্তিও সেই সঙ্গে বহন করিয়া চলিয়াছি।....এই দিল্লীর পথপ্রান্তে একদিন একবস্ত্রে রুক্ষমলিন মুখে অভুক্ত আমি সারাদিন—সারারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। কেহ ফিরিয়াও চাহে নাই—কেহ তত্ত্ব লয় নাই। বুঝিয়াছিলাম ভাগ্যকে সঙ্গে বহন করিয়া আনিয়াছি; সে-ও হয়ত নিয়তিকে অদৃশ্য শূন্যে সাথী

করিয়া আমার পিছু পিছু ঘুরিতেছে, একদিন অনাহারেই উহার কোলে ঢলিয়া পড়িব। কিন্তু নিষ্ঠুরের মত যে কাজ করিয়াছি তাহার পুরস্কার তখনও বাকী ছিল, তাই মৃত্যু আমার হয় নাই।

এক ধনী আমায় মূর্চ্ছিত অবস্থায় গৃহে লইয়া আসেন, তাঁহাদের সেবা-যত্নে সুস্থ হই। পরিচয়ে প্রকাশ পায়—তাঁরা বাংলারই অধিবাসী, কিন্তু এখানে পুরুষানুক্রমে বসতি করিতেছেন, এবং আমাদেরই স্বজাতি। লোকটি সহৃদয়, কিন্তু ব্যবসায়ী। কাপড়ের কল করিয়া হাজার হাজার কুলি খাটাইয়া যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার প্রয়োগ সংসারের সর্ব্বক্ষেত্রেই করিয়া থাকেন। আমার উপরও সেই পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষায় তিনি হইলেন জয়ী, আর দুরাকাঙ্ক্ষ আশার তাড়নায় আমি হইলাম পরাজিত। ক্ষমা করিও মা, যদিও জানি আমি ক্ষমার অযোগ্য, তবুও আমি ক্ষমা চাই। দিদিকে বলিও ক্ষমা করিতে।....তাঁর একমাত্র কন্যাকে আমি এই সর্ত্তে বিবাহ করিলাম যে, দিল্লী ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না, বাংলার নাম মুখে আনিব না, পুরাতন সম্পর্কের কথা ভুলিব। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য আমি, অর্থের জন্য এই সর্ত্তই মানিয়া লইলাম। ভাবিলাম, আপনাদের গোপনে অর্থ-সাহায্য করিব, কেহই বুঝিবে না, জানিবে না।

তখন কি জানিতাম মোগল-রাজত্বে বাস করিয়া বাদশাহী আইন-কানুনে ইহারা কেতাদুরস্ত হইয়াছে! যাহাকে বন্দী করে তাহার চিন্তারাজ্য পর্য্যন্ত দখল করিয়া বসে।

প্রথম দিন মনিঅর্ডার করিতে গিয়া ধরা পড়ি, তিরস্কৃত হই। আমি কলের ম্যানেজার, মাস মাস হাতখরচ লইতাম দু-শ' তিন শ' টাকা। সেই হইতে বিশ পঁচিশ টাকা বরাদ্দ হইল। শুধু পানের খরচ! মা, শুধু তাই নহে, বনের পশুকে কেমন করিয়া বশে রাখিতে হয়, তাহা ইহারা ভাল

রকমেই জানে। আমার সঙ্গে সঙ্গে লোক ফেরে, অলক্ষ্যেও হয়ত ঘোরে এবং দিল্লী ষ্টেশন অভিমুখে আসিলে ইহাদের সর্ব্বপ্রধান আশঙ্কা হয়—পশু শিকল ছিঁড়িল বুঝি! হায় রে দাসত্ব! কিসের প্রলোভনে আজ জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে গিয়া স্নেহশান্তি হারা হইলাম!

আমার বিবাহ! সেও ত বিধাতার অভিশাপ। অর্থও তাই। আজীবন এই অভিশপ্ত সুখের মধ্যে আমায় অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে হইবে। যখনই রাজভোগ মুখে তুলি, মনে হয় ভগ্ন গৃহপ্রান্তে সেই মোটা চালের ভাত—তোমার হস্তের অমৃত পরিবেশন। যখনই অর্থ লইয়া নাড়াচাড়া করি, মনে হয় যেন তীব্র আশীবিষ আমার প্রতি অঙ্গুলি লেহন করিতেছে। মা, শান্তি আমি পাই নাই—হয়ত এ জীবনে পাইব না। জীবনভোর এই অগ্নিরাশির বোঝা বহিয়া সাধের লক্ষপতি সাজিয়া থাকিব এবং তুমিও ইহার খাতিরে রাজজননী আখ্যালাভ করিবে। কিন্তু আমাদের অন্তর ত এক মুহূর্ত্তের তরেও এ কথা ভুলিতে দিবে না, কত বড় মায়ামরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছি ও এই অন্তঃসারশূন্য খ্যাতির মূল্য কতখানি!

আমার হাতখরচের টাকা হইতে কিছু টাকা এক পরিচিত লোকের হাতে গোপনে পাঠাইলাম। মণিঅর্ডার করিতে সাহসী হইলাম না। জানি না, পাইবে কি না? যদি পাও অধম সন্তানের জিনিষ বলিয়া ঘৃণা করিও না, মা, সে উপেক্ষা আমায় মরণাধিক যন্ত্রণা দিবে।........

সমস্ত পড়িয়া মেনকা ডাকিল, "মা!"

মা একমনে পত্রের কথা শুনিতেছিলেন, নয়ন হইতে দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল। স্নেহ-বঞ্চিত লক্ষপতি পুত্রের বেদনায়ও পুত্রসুখার্থিনী দুঃখিনী মায়ের ব্যথার অশ্রু ঝরিয়া পড়ে!

সে বাঁচিয়া আছে এবং জগতের শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্য্যে বিশ্বকাম্য সুখের

সিংহাসনেই বসিয়া আছে। তথাপি যাহারা এ জগতের প্রান্ত হইতে চিরদিনের তরেই চলিয়া গিয়াছে—তাহাদের শোকের চেয়ে এ কি করুণ—মর্ম্মান্তিক !

বহুক্ষণ পরে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরস্বরে মা বলিলেন, "জগতে হয়ত এইটাই সম্ভব। কর্ম্মফল কি না—জানি না, ব্যথার উপর ঘায়ের সৃষ্টি বিধাতাই করেন। আমরা মানুষ, না স'য়ে কি ক'রবো, মা। মিনি, এক ছেলে রাগ ক'রে বাড়ি ছেড়ে গেল,—এক ছেলে অভিমান ক'রে জগত ছেড়ে পালালো—আমার সবচেয়ে দরদী ছেলে অরুণ—আমাদের কষ্ট ঘোচাবার জন্য নিজেকে এ কি ফাঁসে জড়িয়ে ফেল্‌লে ?"

ছোট খোকা কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল। ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আদরের স্বরে বলিল, "মা খিদে পেয়েছে, খাবার দে।"

মেনকা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল, "আয়, আমি খাবার দিচ্ছি। মা, কাপড় ছেড়ে ফেল, সন্ধ্যে হ'য়ে এল, এখনই ওদের বাড়ি না গেলে কালকের মত বকাবকি ক'রবে হয়ত। রান্নাও ত অনেক।"

মা ত্রস্তে উঠিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন ও কাপড় ছাড়িয়া উঠানে দাঁড়াইয়া কন্যাকে ডাকিলেন, "মিনি, তোর হ'ল ?"

ছোট খোকাকে কোলে লইয়া মেনকা রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, চল।"

আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে ম্লানমুখী মাতা ও কন্যা নিঃশব্দে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

বেমানান

দশ টাকা মাসিক ভাড়ার ঘরখানি—রমেশের চক্ষে বড়ই অসুন্দর ঠেকিল।

দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ঘরখানি এত বড় যে, পাঁচ-ছয়টি পুত্রকন্যা লইয়া অনায়াসে তার মধ্যে মাথা গুঁজিয়া থাকা যায়। একতলা এবং স্যাঁতসেঁতে! তা পঞ্চাশ টাকা মাহিনার কেরাণীর পক্ষে ও-দুইটা অসুবিধাই নহে। উত্তর-খোলা নাতিবৃহৎ জানালা দিয়া একটু যে হাওয়া না আসে তাহা নহে, আলোও চোরের মত উঁকি মারে। চুনবালি দিয়া গৃহস্থ এককালে ঘরের শ্রীবর্দ্ধন করিয়াছিলেন হয়ত, কিন্তু রমেশ পনের বৎসরের মধ্যে এ বাড়িতে মিস্ত্রিকে প্রবেশ করিতে দেখে নাই।

যে বড় বড় ইঁদুরের উৎপাত কলিকাতায়—মেঝের উপর যেন লাঙল চষিয়াছে। ছেলেমেয়েরা সেই কর্ষিত মেঝে হইতে ছোট ছোট ইটের টুকরা বাছিয়া লইয়া কখনও টক্কাফক্কা, কখনও বা জোড়বিজোড় খেলিয়া নিজেদের ক্রীড়াপটুতা দেখায়। এ বিষয়ে তারা উৎসাহশীল। বাপের প্রহার বা মায়ের তাড়না কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। সামনে ছোট ফালি বারান্দা। দরজা ঘেরিয়া রান্নাঘর তৈয়ারী হইয়াছে। রাত্রিতে তোলা-উনানটি ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া রান্না চাপান হয়। সকালের রাঁধা ডাল তরকারী সবই থাকে—শুধু ভাত ফুটাইয়া লইলেই হইল। সুশীলা হিসাবী গৃহিণী—কয়লা বেশী খরচ হইতে পারে না। ভাত নামিলেই বাসি ডাল তরকারী গরম করিয়া লয়।

উনানের ধোঁয়ায় বারান্দার কড়িকাঠ ত দেখাই যায় না, ঘরের কড়িকাঠেও ঝুল প্রচুরতর জন্মিয়াছে। কোণে কোণে মাকড়সার বাসা।

ঘরের বাসিন্দাদের মত তাহাদেরও আশ্রয়চ্যুতির ভয় নাই। মাঝে মাঝে একটা চড়াই পাখী কিচ-কিচ করিয়া উঠে। কড়িকাঠের ফাঁকে সে রাত্রি যাপন করিতে ভালবাসে।

ঘরের এক পাশে ভাঁড়ারের জিনিষপত্র—জালায় চাল, হাঁড়িতে বা বিস্কুটের টিনে ডাল এবং সিগারেটের ছোট ছোট কৌটাগুলিতে মশলা, চিনি, সুজী ইত্যাদি। পেতে-ভর্ত্তি আনাজপাতিও তার এককোণে জড়ো করা। অন্য কোণে একখানা তক্তা পাতিয়া কেরোসিন ও নারিকেল তৈলের বোতল এবং আধভাঙা হ্যারিকেন লণ্ঠন গোটা-দুই সাজান রহিয়াছে। ঘরখানিতে গোটাদুই দরজাহীন গা-আলমারী আছে। উপর নীচে তার অনেক জিনিষ। কোনটায় বাসনগুলি মাজিয়া রাখা হয়, কোনটায় ময়দা, তেঁতুল ইত্যাদির হাঁড়ি—কিংবা খোকাখুকুদের খেলনা, পড়িবার বই খাতা, ঔষধের শিশি—অগোছালো ভাবেই রহিয়াছে।

আলমারির পাশে বিছানা গুটানো, তার একটু উপরে দেওয়ালে পেরেকে টাঙানো আর্‌শি একখানা। আরশিখানা ভাল। শীর্ণমুখ-গুলিকে পুষ্ট দেখায়। রং-ওঠা ট্রাঙ্ক, বেতের সুটকেস—বিছানার পাশেই।

কড়িকাঠ হইতে পাঁচটি শিকা ঝুলিতেছে। বিড়ালের ভয়ে হেঁসেল-পাট উহারই উপর ঝুলিতে থাকে। বারান্দার এক কোণের দেওয়ালে পেরেক পোঁতা। তাহার উপর ছোটবড় অনেকগুলি জুতা টাঙানো।

মানুষের বুদ্ধির অপ্রতুলতা না থাকিলে এক ফালি জায়গার মধ্যে প্রকাণ্ড সংসারটাকে অনায়াসে ভরিয়া রাখা যায়।

এক জানালায় জলের কুঁজা, অন্যটায় পানের ডাবর। চুনে-খয়েরে সেখানকার দেওয়ালটা চিত্র-বিচিত্র হইয়াছে। দড়ির আলনায় কাপড় জামাগুলি ঝুলিতেছে। গরীব হইলেও গৃহস্থের রুচি আছে। কালী, দুর্গা, গান্ধী ও সি-আর দাশের ছোট ছোট ছবিগুলিও দেওয়াল-গাত্রে

বিলম্বিত রহিয়া ধর্ম্ম ও রাজনীতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই বড় ঘরখানির মধ্যে কোনরূপ অশোভনতা রমেশ কোনদিন দেখে নাই বা অসুবিধাও ভোগ করে নাই। আজ কিন্তু মনে হইল এ সমস্তই বিড়ম্বনা। কারণ গতকল্য সে একটা গার্ডেন পার্টিতে যোগদান করিয়াছিল।

আপিসের কোন পদস্থ কর্ম্মচারীর বিদায়-অভিনন্দন উপলক্ষ্যে শহরের উপকণ্ঠে একখানি সুন্দর বাগান-বাড়িতে সকলে সম্মিলিত হইয়াছিল।

শনিবার। বেলা দুটায় আপিস বন্ধ হইবামাত্র শততালিযুক্ত ছাতাটি মাথায় দিয়া রমেশ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে পথ অতিবাহন করিতেছিল।

ফুটপাথের যে-ধারটায় ছায়া পড়িয়াছে, সেদিকে একজন মুসলমান বালক ময়লা কাপড় বিছাইয়া একরাশ কেডস্ জুতা স্তূপীকৃত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিতেছিল, সস্তামাল—লেও বাবু, আট আট আনা জোড়া —আট আট আনা।—

নিজের পায়ের জুতার পানে চাহিয়া রমেশ একবার থমকিয়া দাঁড়াইল।

নাঃ, কালি মাখাইলেও এই জুতা পায়ে দিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষাই করা যায় না—তায় গার্ডেন পার্টি। তলার কাঁচা চামড়ার বোঝায় হাফ্‌শুলটা ভারী হইয়াছে পাঁচ সের। গার্ডেন পার্টিতে কেহ আর জুতার তলাটা বিশেষ করিয়া দেখিবে না, কিন্তু উপরের তালিগুলি! ব্রাউন চামড়া মিলে নাই বলিয়া একখানি তালি ত কালো চামড়ারও দেওয়া হইয়াছে।

পকেটে হাত দিয়া দেখিল কয়েকটা টাকা আছে। কাল মাসকাবার

হইয়াছে—মাহিনা মিলিয়াছে। এখনও মুদী ও গোয়ালার হিসাব মিটানো হয় নাই। বাড়িভাড়াও বাকী। সমস্ত দেনা পরিশোধ করিলে যাহা হাতে থাকে তাহাতে আরও কর্জ্জের গোটাপাঁচেক টাকা যোগ করিলে তবে সংসার কোন রকমে চলে। পুরা মাহিনা কথনও সে পায় না। বাঁচিয়া থাকুক কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট সোসাইটি। দেনা শোধ হইতে-না-হইতে নূতন দেনার জন্য দরখাস্ত দিতেই হয়।

তবু গার্ডেন পার্টিতে যাইবার জন্য জুতা কিনিবার ইচ্ছাটা তাকে কেমন যেন পাইয়া বসিল। দুঃখ-কষ্ট ত আছেই। পাঁচজনের সামনে একটু ফিট্‌ফাট্ হইয়া না গেলে ভদ্রলোকের প্রাপ্য সম্মানটুকুও সে পাইবে কি-না সন্দেহ!

বহু দরদস্তুর করিয়া আট আনার জুতা হইতে সে দুইটি পয়সা বাঁচাইল। কাগজে জুতা মুড়িয়া চলিবে এমন সময় সহকর্ম্মী বিমল পিছন হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হে, কতয় কিন্‌লে?

রমেশ এক গাল হাসিয়া বলিল, আট আনার কম কিছুতে কি দেয়! কত ভুজুং-ভাজুং দিয়ে সাড়ে সাত আনায় বাগিয়েচি।

বিমল বলিল, যাই হোক গার্ডেন পার্টির মান ওতে বজায় থাক্‌বে। আমার ভাই—যা করেন এই স্যাণ্ডাল।

রমেশ বিমলের দুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া কহিল, তা ওই বা মন্দ কি!

পরে গর্ব্বিত অপাঙ্গে নিজের কাগজমোড়া জুতার পানে চাহিয়া মনে মনে বলিল, কেডস পায়ে দিলে বোধ হয় বেশ একটু আভিজাত্যের গন্ধ পাওয়া যায়।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল, ক'টায় যাচ্চ?

একটু ভাবিয়া রমেশ বলিল, পাঁচটায়।

বিমল বলিল, আমিও তাই। এই টুইল শার্টটাই বাড়ি গিয়ে কাচ্‌বো। রোদে শুকিয়ে গরম জলের ঘটী বসিয়ে ইস্ত্রি করব, তবে ত!

রমেশ মনে মনে বলিল, আমারও ওই দশা।

কিন্তু হাতে কেডস্ ছিল বলিয়া সে অল্প একটু পা চালাইয়া দিল! সবে দুটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে।

সূর্য্যের তেজ প্রখর, জামা দিব্য শুকাইয়া যাইবে।

পাঁচটার মধ্যেই জামা শুকাইল এবং ইস্ত্রি করা হইল।

সুশীলা জামাগুলা কাচে ভাল। দিব্য ফরসা হয়। ফরসা যেন বেশীই হইয়াছে! কাপড়খানার সঙ্গে বেমানান্ হইবে নাকি? না, ও একটু ইতরবিশেষ কাহারও চোখে পড়িবে না। খানিকটা ত ফরসা জামায় ঢাকিয়া গেল, বাকী অংশে কে আর নজর দিতে যাইবে।

চুলগুলা আঁচড়াইয়া পিছন দিকে ঠেলিয়া দিল। কি বলে ভাল, আমেরিকান ফ্যাশান। চেহারা এককালে রমেশের ভালই ছিল। এখনও প্রসাধন করিলে ছোক্‌রা না হউক, নবযুবকের মত দেখায়। যদিও আসলে তার বয়স বত্রিশ।

চোয়ালের হাড় উঠিয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, ও কপালে কয়েকটি শিরা দেখা দিয়াছে। তবুও জামা কাপড় ও কেশের পারিপাট্যে একটা শ্রী ফুটিয়া উঠে।

সুশীলা বুদ্ধি করিয়া তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্কের কাপড় ও জামা ওলটপালট করিয়া বহু পুরাতন একটি এসেন্সের শিশি বাহির করিল। বিবাহের সময় এই শিশি গায়ে হলুদের তত্ত্বে গিয়াছিল—সে আজ বার-তের বছরের কথা। গোছালো বলিয়া শিশিটি সুশীলা তুলিয়া রাখিয়াছে। পূজার সময় ছেলেমেয়েদের গায়ে বিন্দুকয়েক খরচ হয়। এসেন্সের রং ফ্যাকাসে হইয়াছে, গন্ধ ত নাই-ই, আছে একটা ঝাঁঝ।

রমেশ আনন্দিত হইয়া বলিল, আর সিল্কের সেই রুমালখানা?

সুশীলা ভাঁজ-করা রুমালখানি সন্তর্পণে রমেশের বুকপকেটে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, আস্তে আস্তে বার ক'রে মুখ মুছো। খবরদার খুলো না যেন।

রমেশ কহিল, আর্‌শিখানা একবার দাও ত।

আরশির সামনে নানা ভাবে ঘাড় কাৎ করিয়া চেহারা দেখিয়া রমেশ খুশিই হইল।

ছোট ছেলেটি আসিয়া বলিল, হুঁ বাবা, আমার জন্যে লুচি সন্দেশ আন্‌বে ত?

রমেশ তাহাকে অল্প একটু ধমক দিয়া বলিল, হাঁ—নেমন্তন্ন খেতে যাচ্চি কি-না! যত সব হ্যাংলা!

সুশীলা তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, ছাদে যাবি? চ উড়োজাহাজ দেখাব।

ঠোঁট ফুলাইয়া বালক বলিল, জাহাজ, না ছাই! সন্দেশ আন্‌বে না—তাই।

সুশীলা মৃদু কুন্ঠিত স্বরে রমেশকে বলিল, কালো রুমালখানা দেব? যদি পার ত—

রমেশ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—হ্যাংলার গুষ্টি। এই জামা-কাপড় প'রে সন্দেশের ছাঁদা আনলে মুখখানা বুঝি পুড়ে যাবে না?

সুশীলা আর কোনো কথা কহিল না। রমেশ চলিয়া গেল।

মনটায় একটু যে দাগ না ধরিল তাহা নহে। একটি টাকা চাঁদা দিতে হইয়াছে। টাকাটা থাকিলে আধ সের ভাল মাছ ও দুটি করিয়া সন্দেশ বা রসগোল্লা ছেলেদের পাতে দেওয়া যাইত। খাইতে পায় না বলিয়া ছেলেগুলা বড় হ্যাংলা হইতেছে! কিন্তু না, টাকাটা থাকিলে কি আর

সন্দেশ মাছ আসিত? দেনা শোধ করিতেই কোথায় কর্পূরের মত উবিয়া যাইত।

কিছুতেই মন শান্ত হয় না দেখিয়া অবশেষে রমেশ মনে মনে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল, আগামী মাসের মাহিয়ানা হইতে একটি টাকা সে পৃথক করিয়া রাখিবেই। হয় সন্দেশ নতুবা বড় একটা ইলিশ মাছ।

ট্রেনের যে কামরায় দুইজন সহকর্মী বসিয়াছিল রমেশ অনেকখানি খালি জায়গা দেখিয়া তাহাদের পাশে গিয়া বসিল। বিমল এখনও আসে নাই।

প্লাট্‌ফরমে ফেরিওয়ালার চীৎকার ও যাত্রীদের ব্যস্তভাবে যাতায়াতের দৃশ্য নিশ্চিন্তে বসিয়া উপভোগ করা যায়। মাঝে মাঝে সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরাইয়া গল্প ও রুমালখানি বাহির করিয়া মুখ মুছিতেও বেশ ভাল লাগে। রিষ্টওয়াচ থাকিলে ট্রেন ছাড়িবার সময় উত্তমরূপে জানা সত্ত্বেও পাশের ভদ্রলোককে ট্রেনের সময় জিজ্ঞাসা করা ও নিজের ঘড়িটি পুনঃ পুনঃ দেখায় খানিকটা গর্ব্ব ফুটিয়া উঠে।

ভদ্রলোকের ছেলেরা সব পাস করিয়া ক্যান্‌ভাসার হইয়াছে। চাকরি জুটিলে কি আর এই লাইনে কেহ আসিত? যে পরিশ্রম! কানে তুলা গুঁজিয়া বড় ঝুলি বা ভারী সুটকেস বহিয়া বেড়াইতে হয়। মুখে চুরুট গুঁজিয়া দিব্য বেঞ্চের উপর পা তুলিয়া দিয়া ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরাণীবাবু তাহাদের নিকট হইতে কখনও-বা কোনো জিনিষ কেনে, কখনও-বা বিদ্রূপের হাসি হাসে।

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল। ট্রেন ছাড়িতে পাঁচ মিনিট বিলম্ব আছে। কুলীরা ছুটাছুটি করিতেছে। গার্ড ব্যস্ত হইয়া নোট বুকে কি

ঢুকিয়া লইতেছে। ষ্টেশন-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছড়িহাতে প্লাটফরমের এধার-ওধার ঘুরিতেছেন। আহা! বেচারীরা নাকি রবিবারেও ছুটি পায় না।

অকস্মাৎ দরজার কাছে মহা কোলাহল হইল।

হ্যাণ্ডেলটা ঘুরাইয়া কে দুয়ার খুলিয়া ফেলিল ও একপাল কুলীমজুর শ্রেণীর লোক কিছু বলিবার পূর্ব্বেই পিল-পিল করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

রমেশ মুখ বাঁকাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া বসিল। পাছে বা জামাটায় দাগ লাগে!

রমেশের একজন সহকর্ম্মী বলিলেন, নাঃ, উঠতেই হ'ল। এই সব ছোটলোকদের সঙ্গে যাওয়া মানে—

মানে যাহাই হউক, তিন জনেই উঠিয়া অন্য কামরায় চলিল।

অন্য দিনের কথা স্বতন্ত্র—কিন্তু আজ বিশেষ রকমের বেশভূষা করিয়া উৎসবক্ষেত্রে যোগদান করিতে চলিয়াছে, ছোটলোকের গাড়ি হইতে নামিতে দেখিলে অন্যেরাই বা কি বলিবে?

বাগানের পথে ত্রিশ জন সঙ্গী জুটিয়া গেল। এক সঙ্গে মিলিয়া কলরব করিতে করিতে সকলে হাঁটিতে লাগিল।

বাগানের দুয়ারে দুই জন অভ্যর্থনাকারী দাঁড়াইয়া ছিলেন। একজন পিচকারী করিয়া গোলাপ-জল ছিটাইয়া নব আগন্তুকদের আধভেজা করিয়া দিলেন, অপর ব্যক্তি ঝুড়ি হইতে লাল গোলাপ ফুল ও একখানি করিয়া প্রোগ্রাম সকলের হাতে বিতরণ করিতে লাগিলেন। বটন্ হোলে ফুল গুঁজিয়া অনেকে ভিতরে গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল। অনেকে শার্টের বুক-পকেটে গুঁজিল—অধিকাংশই হাতে লইয়া শুঁকিতে লাগিল।

রমেশ ফুল লইয়া প্রথমটা বুক পকেটেই গুঁজিল, কিন্তু সেটি পকেটের

মধ্যে ডুবিয়া যাওয়ায় হাতেই রহিল। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অবশেষে শার্টের একটি বোতাম খুলিয়া তাহার মধ্যে ফুলের বোঁটাটা গলাইয়া বোতামটি আঁটিয়া দিতে গেল; বোতাম আঁটিল না। ঈষৎ জোর করিতেই পলকা ঝিনুকের বোতাম পুট করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। রমেশ অপ্রতিভ হইয়া চারিদিক চাহিল—কেহ এই লজ্জাকর ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছে কি-না! না, কেহই দেখে নাই। কাছাকাছি পকেট হাতড়াইয়া একটা পিন বাহির করিয়া ফুলটাকে দিব্য আটকাইয়া রাখিল। ছেঁড়া বোতাম বা পিন্ ফুলের নীচেই ঢাকা রহিল।

কার্ডে লেখা রহিয়াছে—প্রথম আইটেম চা ও সামান্য জলযোগ।

বাগানের কোণের ঘরটায় লোকের হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে। ওখানে নাকি চা তৈয়ারী হইতেছে। একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী চা বিতরণের ভার লইয়াছেন। তিনি সকলকে উদ্দেশ করিয়া হাসিমুখে বলিতেছেন, তাড়াতাড়ি করবেন না। তাড়াতাড়ি করলে আপনাদেরই কষ্ট।

কিন্তু কে শোনে সে কথা। শীঘ্র না হইলে চা যেন উঠিয়া যাইবে!

ঠেলাঠেলি করিয়া রমেশ এক কাপ পাইল। প্লেটে আটখানি করিয়া লাঠি বিস্কুট।

ট্রেনে আসিয়া বেশ ক্ষুধা পাইয়াছে। বিস্কুট কখানি চিবাইয়া চোঁ-চোঁ করিয়া সে চা'র পিয়ালা নিঃশেষ করিল এবং আর এক কাপ পাইবার প্রত্যাশায় হাত বাড়াইল। এমন অনেকেই করিতেছে।

দ্বিতীয় কাপ শেষ করিয়া সে জলখাবারের ঘরের দিকে চলিল।

জলখাবার সামান্যই বটে!

রমেশ মাটির রেকাব হাতে লইয়া হিসাব করিতে বসিল:

চপ	৴০ আনা
কাটলেট্	৴০ আনা

সিঙ্গাড়া ও কচুরি ৴০ আনা
নিম্‌কি ৲১০ পয়সা
পান্তুয়াটা ৴০ আনার কম নহে।
সন্দেশ (আধপোয়া) নির্য্যস ৶১০ পয়সা
ল্যাংড়া আমটাই কোন্ ৴০ আনার কমে মিলিবে !

এই গেল ॥০ আনা।—চা দু-কাপ ৴০ আনা ও বিস্কুটও ৴০ আনা। এক টাকা চাঁদার বাকী রহিল ছ-আনা। ওদিকে মাংস-পোলাও চিংড়ীর মালাইকারী, লুচি, ছানার পায়েস, ভাল দই, আইস্‌ক্রীম সন্দেশ—দুটি টাকা অনায়াসে উশুল করা যাইবে। পান ও সোডা গোটা-দুই খাইয়া রাখিলে, হজম হইবে—ক্ষুধাও পাইবে। চাই কি ২॥০ টাকার জিনিষও....

লোভার্ত্ত চোখ দুইটা তাহার জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল। বাড়ির নিকটে হইলে মন্দ হইত না। কিংবা যদি কালো রুমালখানা সে আনিত !

ওধারে ঘাসবিছানো জমিটায় গোল করিয়া চেয়ার পাতা হইয়াছে। পদমর্য্যাদাশীলেরা বসিয়া বসিয়া চুরুট ফুঁকিতেছেন ও প্রোফেসার চিত্তরঞ্জনের কৌতুকাভিনয় দেখিয়া ঘন ঘন করতালি দিতেছেন। উর্দ্দিপরা চাপরাসীগুলি ট্রেতে করিয়া পান, সিগারেট ও লেমনেড লইয়া ঘুরিতেছে। ভলান্‌টিয়ার ছোক্‌রারা ডিসে খাবার সাজাইয়া তাঁহাদের খাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। কেহ এক টুক্‌রা সিঙাড়া মুখে দিয়া ডিসখানি ঠেলিয়া দিতেছেন, কেহ-বা একটা সন্দেশের খানিকটা

ভাঙিয়া মুখে দিয়া বলিতেছেন,—বাঃ সুন্দর জিনিষ! নাগের দোকানের নাকি?

এবং পরিপূর্ণ ডিসগুলি নামাইয়া রাখিয়া চুরুট টানিতে টানিতে সঙ্গীর সঙ্গে পূর্ব্ববৎ গল্প করিতেছেন। ডিসখানার খাবার যে সবই নষ্ট হইল সেদিকে খেয়াল নাই।

রমেশের ভারি রাগ হইল। এত খাবার যে নষ্ট হইল, ভলান্টিয়াররা ডিস ধুইবার সময় সব পুকুরের জলে ভাসাইয়া দিল—সে ক্ষতিটা কেহ দেখিতেছে না। দু-চার জন ছেলেপুলে সঙ্গে আনিলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইত! না, হিসাবজ্ঞান কাহারও নাই।

রমেশ দেখিল ঘড়িতে প্রায় সাতটা বাজে। কলিকাতায় ফিরিবার ট্রেন সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাইবে। চাই কি, এক ঘণ্টার মধ্যে খানকয়েক সরা লইয়া সেই নাতিবৃহৎ ঘরখানিতে নামাইয়া দিয়া অনায়াসে ফিরিয়া আসিয়া উৎসব-ভোজে যোগদান করিতে পারে। কিন্তু সরা লইয়া চুপি চুপি সরিয়া পড়িবার সুবিধা কই? দুয়ারে অভ্যর্থনাকারীরা দাঁড়াইয়া অতিথিদের আপ্যায়িত করিতেছেন!

কেন রে বাপু, অভ্যর্থনা করিবার এত কি মাথাব্যথা! কেহ কাহারও বাড়ি নিমন্ত্রিত নহে যখন—

তারপর, ধরা পড়িলে লজ্জার আর অবধি থাকিবে না। সকল লোকই হাসিয়া আঙুল দেখাইয়া বলিবে,—ওই দেখ, লোকটা এমনও হ্যাংলা!

হ্যাংলা কে নয়? দু-বার চা খাইয়া তৃতীয় বারের জন্য যাহারা হাত পাতে, দু-ডিস খাবার খাইয়াও যাহাদের তৃপ্তি হয় না, অফুরন্ত পান-

সিগারেট খাইয়া চোখ-মুখ লাল করিয়াছে, সোডা লেমনেডের রাশি গিলিয়া পেটের মধ্যে জল গড়াইবার মত ঢক্ ঢক্ শব্দ হইতেছে—তাহারা বুঝি সাধু? মনে মনে সকলেরই তৃতীয় রিপুর আধিক্য। সকলেই হয়ত খাবার খাইবার সময় বাড়ির ছেলেমেয়েদের কথা একবার না-একবার ভাবিতেছে। অথচ, যদি কেহ চোখের সাম্‌নে কিছু সংগ্রহের চেষ্টা করে ত ব্যঙ্গবিদ্রূপে তাহাকে জর্জ্জরিত না করিয়া উহাদের শান্তি নাই। নিজের অক্ষম ইচ্ছাকে পরের মধ্যে পরিস্ফুট হইতে দেখিলে নীতিরক্ষার অছিলায় অমনই লোকে গর্জ্জন করিয়া উঠে। যেন সৃষ্টি রসাতলে গেল আর কি!

বড় বড় অফিসাররা কেন সন্দেশ চাখিবেন না? নিত্য প্রাচুর্য্যের প্রাণরসে তাঁহারা সজীব। বাজারে ভাল মাছটি দেখিয়া না-কিনিবার বেদনা বহিয়া কোনো দিন তাঁহাদের বাড়ি ফিরিতে হয় না কিংবা দোকানে সাজানো নাম-না-জানা হরেক রকমের খাবার জিনিষের পানে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাসও তাঁহারা কোনো দিন ফেলেন না। গাড়ি বল, পোষাক-পরিচ্ছদ বল, দেশভ্রমণ, সিনেমা, থিয়েটার, কোন্ সখটা তাঁহাদের পূর্ণ না হইতেছে? ফরসা কাপড়-জামা বাবুয়ানা উহাদেরই মানায়।

এই বাগান—সবুজ ঘাসে ছাওয়া, মরসুমী ফুলের সৌন্দর্য্যে ঝল্‌মল্, ঝিলের বুকে সবুজ বোট, ক্রোটনের ঝোপে ঝোপে কুঞ্জ রচনা, অতিথির অভ্যর্থনায় ফুল ও গোলাপ-জল বিতরণ,—খাবারের রকম—কোনটাই রমেশদের মত প্রাণীর পক্ষে নহে। এমন কি, এই অবারিত একটানা মুক্ত বাতাস ও অজস্র আলোর বন্যা গুরুপাকের মতই বোধ হইতেছে!

উঁহারা হাসিতেছেন কেমন প্রাণখোলা হাসি। খাবারের দিকে

চাহিয়া দুশ্চিন্তা নাই, লাভক্ষতির হিসাব নাই, পুত্রকন্যাদের জন্য এক তিলও ভাবনা নাই।

খাইতে বসিয়া যেন হাস্য-কলরব বাড়িয়া উঠিল। রমেশ এক কোণে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া আহার করিতেছিল। কি সব তরকারীর নামও জানে না—খাইতে চমৎকার।

ভাল লাগিতেই বলিতেছে,—ও মশাই, একবার এই দিকে আসবেন ত। না, না, লুচি নয়—পোলাও চাই না, হাঁ, ওই থেকে একটু মাছ বেছে। মুড়ো নেই? দইয়ের মাথাটা ভেঙে দেবেন ত। রসগোল্লা থাক, বরং আপনার আইসক্রাম সন্দেশটা একবার—আহাহা! একেবারে অতগুলো দিলেন।

পেট ভরিয়া খাইয়াও দশ-বারটি সন্দেশ পাতে পড়িয়া রহিল। রমেশ ভাবিতে ভাবিতে প্রায় যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। এগুলি ফেলিয়া দিবে? অপচয় করা কি ভাল? কিন্তু উপায়ই বা কি।

এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিল,—পান লইবার ব্যস্ততায় সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, কাহারও নজর এদিকে নাই। ভাবিয়া-চিন্তিয়া রমেশ এক দুঃসাহসিকের কাজ করিল। টপাটপ সন্দেশগুলি পকেটে পুরিয়া সেই দিকটায় চাদর ঝুলাইয়া দিল। পকেট উঁচু হইলেও চাদরে ঢাকিয়াছে বেশ, কাহারও সন্দেহ হইবে না। ট্রেনে বসিবার সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করিলেই, ব্যস্! যে-দিকে কোণ সেইদিকে পকেট রাখিলে মিষ্টগুলি চ্যাপ্টাইয়া যাইবে না। দিব্য নিরাপদে এবং সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছান যাইবে। চাদর ঢাকিয়া রাবড়িটাও লওয়া যায়, কিন্তু অসুবিধা অনেক। একহাত জোড়া করিয়া পথ চলা

—কেহ দেখিয়া ফেলিতে পারে, চলকাইয়া চাদর নষ্টও হইতে পারে। না, থাক। ওদিকে চাহিয়া চক্ষুকে মিছাই সকরুণ করা।

সন্দেশ লুকাইয়া এদিক-ওদিক চাহিতেই নজরে পড়িল, আরও জনকয়েক রমেশের মত সন্ত্রস্ত ভাবে এদিক-ওদিক চাহিতেছে। উহারাও হয়ত এই পথের পথিক। রমেশ মনে মনে হাসিয়া হাত মুখ ধুইল। পান লওয়া আর হইল না।

মান-সম্ভ্রম প্রায় বাঁচিয়া গিয়াছিল, কিন্তু রাস্‌কেল হরিশটার জন্য সব ফাঁসিয়া গেল। এত সতর্কতা সত্ত্বেও সে খপ করিয়া তাহার পকেটে হাত পুরিয়া দিয়া কহিল,—মেলাই পান নিয়েচ যে, দাদা! দেখি দুটো। বলিয়া হাত টানিতেই একমুঠা সন্দেশ বাহির হইল। হরিশ চীৎকার করিয়া কহিল,—আরে ছোঃ, এ যে সন্দেশ! ক্যায়সা ভানুমতীর খেল্ দেখ—পান হয়ে গেল সন্দেশ!

সমবেত জনতার উচ্চ হাস্যধ্বনিতে রমেশ মূর্চ্ছিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল,—কেন যে জ্ঞান হারাইয়া সেইখানে পড়িয়া গেল না—সেইটাই আশ্চর্য্য! শতকণ্ঠের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তীরের মত শাণিত।

এমন কৌতুক অনেক দিন কেহ ভোগ করেন নাই যেন! প্রীতিভোজনের এই হাসির ব্যাপারটাও উৎসবের সুচারু-অঙ্গ!

হুম্ হুম্ শব্দে ট্রেন আসিল। রমেশ কিছুই শুনিতে পাইল না। না গাড়ির গর্জ্জন, না উহাদের হাসির তীক্ষ্ণ ধ্বনি।

হরিশই অভিভূত রমেশকে ঠেলিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিল। নির্ব্বিঘ্ন একটি কোণ রমেশের ভাগ্যে মিলিল এবং সেই দিকে সন্দেশ-মাখা পকেট লইয়া সে বসিতেও পাইল। না পাইলেই বা কি ক্ষতি হইত! বরং আসিবার কালে এক পাল কুলী যেমন গাড়িতে উঠিয়াছিল, তেমনই কুলীর ভিড়ে সে যদি ঢাকিয়া যাইত! বেশ হইত।

হরিশ পকেট হইতে তিন প্যাকেট সিগারেট বাহির করিয়া কহিল,—এই দেখ এখন দশ দিনের দায় নিশ্চিন্ত। ব্যোমকেশটা চালাক খুব। আটটা প্যাকেট ও গোটা-পঁচিশেক বর্ম্মা বাগিয়েচে। ননী, পান আছে তোমার কাছে?

একগাল হাসিয়া ননী পকেট হইতে মুঠাভর্ত্তি পান বাহির করিয়া সকলকে এক একটা দিল। সকলেই খুশি হইয়া সিগারেট ধরাইল।

হরিশ কহিল,—নাও না হে রমেশ,—পান খাও। আরে ছোঃ—সন্দেশ মাখিয়ে পকেটটাকে নষ্ট করেছ! পরে গোটা-দুই পান ও একটা সিগারেট তার মুখে গুঁজিয়া দিয়া কহিল,—দুটো পান আনলে যে কাজ দেখতো। নাও ধর—আগুনটা নইলে নিবে যাবে।

বিড়ি, সিগারেট বা পান সংগ্রহে যথেষ্ট বীরত্ব আছে সন্দেহ নাই। মান-সম্মানের বেড়ার বাহিরে বলিয়া ও-গুলি কোনকালে অভ্যাগতকে অপদস্থ করে না। অথচ সন্দেশ? মান নষ্ট ত হয়ই, পকেটও। সংসারের উপর তার ভারি রাগ হইল। যত সব হ্যাংলা ছেলেমেয়ে কি তার ঘরে?—মায় সুশীলা পর্য্যন্ত! আসিবার সময় কালো রুমালখানা দিবার কথা না বলিলেই কি তার হইত না? লোভকে উস্কাইয়া দেওয়া বইত না! আসিয়া অবধি সে কালো রুমালখানার কথা অনবরত ভাবিয়াছে। অভাবগ্রস্ত সংসার, হ্যাংলা ছেলেমেয়েগুলার বায়না, আগামী মাসের খরচের হিসাব—যত ছাই আর ভস্ম। ম্যাজিক, গান, কৌতুকাভিনয় কোনো কিছুই তাহাকে আকর্ষণ করে নাই। কেবল শততালি দেওয়া সংসার ও তার চারিদিকে কুৎসিত কালো ছায়া। ঐ সব ভাবনা যেন ঝাঁঝওয়ালা বড় পিঁয়াজ—চোখের জল টানিয়া বাহির করিতে উহাদের ক্ষমতা অদ্ভুত।

পান চিবাইতে চিবাইতে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া কোণের দিক

হইতে পকেটটা টানিয়া উল্টাইয়া অবশিষ্ট সন্দেশ ফেলিয়া দিতে দিতে কহিল,—ওই বিমলটা বসেছিল আমার পাশে—এ-সব তারই কাজ। আহাম্মক! চার আনা দামের স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে গার্ডেন পার্টিতে এসেছে—লজ্জাও নেই!

এ কথায় ট্রেনের কেহ হাসিল না।

এবং সেই স্তব্ধতার দুঃসহ লজ্জায়, সত্য বলিতে কি, সেই মুহূর্তে দশ টাকা মাসিক ভাড়ার ঘরখানি রমেশের চক্ষে বড়ই অসুন্দর ঠেকিল।

বন্যা

দামোদরের হঠাৎ বন্যা আসিয়া গেল। বন্যা না আসিলে নিউকর্ড ও মেনলাইন এ ভাবে বিপর্য্যস্ত হইত না। আসলে বিপর্য্যয়টা মানুষিক, রেললাইনগুলা কিছুদিন অন্তত জলের তলায় ডুবিয়া বাঁচিল। অবিশ্রান্ত লৌহচক্রের ঘর্ষণে যে জ্বালা উহাদের সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত—তাহার কিছুটা নিবৃত্তি ঘটিল তো!

অতি বর্ষার ফলে পাহাড়ে নামিল জল—দামোদরের বালুগর্ভ সে জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না। ....বাঁধের আশ্রয়ে মানুষ বন্যাকে রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে কতকাল হইতে, তবু বাঁধের বাঁধনে সে জলস্রোত রোধ করা গেল না কেন—তাহার ক্ষুদ্র হেতু আছে। অবশ্য হেতুটাই গল্প।

গ্রামের নামটা বাদ দিয়াই বলি। নন্দ ও উপানন্দ দুই ভাই (গোকুলের নয় এবং দ্বাপরেরও নয়)। দু'টি ভাইয়ে সদ্ভাব আছে। কেন না, অনেক বিঘা সোনা-ফলানো জমির মালিকানা স্বত্ব উহারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে। শুধু ধান নহে, আলুটা, খন্দ-কুটাটা, সরিষা-তিসিটাও জমি হইতে আসে। আনাজপাতি ঋতু অনুযায়ী যাহা জন্মায় গৃহস্থের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। সবাইয়ের শোভা, বউয়েদের মুখে হাসি, ছেলেদের সতৃপ্ত কলরব ইত্যাদিতে লক্ষ্মীশ্রী পরিস্ফুট। নিজেদের হালবলদ আছে—মুনিষজন আছে, বিলাসিতা ও আলস্য কম,—কাজেই লক্ষ্মী প্রীতিময়ী। বাড়িতে বৈষ্ণব ভিখারী 'জয় রাধে কৃষ্ণ' বলিলে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে এক মুঠা পায়—কিন্তু ভাতের দাবি জানাইলেই মুশ্‌কিল।

ভিখারী স্বাস্থ্যবান হইলে নন্দ বলে, কাজ করবি জমিতে? জমি

নিড়োনো, বীজ ছড়ানো? পারিস যদি দেখ—দু'বেলা দু'মুঠোর ব্যবস্থা করি। ভিখারী কাল আসিব বলিয়া সরিয়া পড়ে। নন্দরা জানে—ও আর আসিবে না। যাহারা জনমজুরি করিতে আসে—তাহারা মুঠা বাঁধিয়া বিনা আয়াসে পেট ভরায় না।

উপানন্দের মনটা কিছু কোমল। বলে, দিলেই হ'ত দাদা এক মুঠো। একটা দিন বৈ ত না।

নন্দ বলে, ভাইরে, মনটা কোমল হওয়া ভাল; কিন্তু তারও মাত্রা আছে। পৃথিবীতে যে যুদ্ধ বেধেছে তার ধাক্কা সামলানো সোজা ভাবিস?

উপানন্দ বলে, হয়ত এমন দিন আসবে—না খেতে পেয়ে ধানের গোলা লুটবে।

নন্দ হাসে, ওরা করবে লুঠ! কিছু কম দু'শো বছর হ'ল না? এ তো আর তোর দামোদর নয়—এ হ'ল গিয়ে ভৈরব। দেখতো যশোরের কাছে—কি হাল হয়েছে। কচুরিপানার জগদ্দল বোঝা বুকের ওপর; যখন ফুল ফোটে দেখলে দু'চোখ জুড়োয়!

—যদি পেটের দায়ে লুঠ করে?

—ওরে বোকা—শেষ অবস্থায় লোকে মরিয়া হয়ে ওঠে। যেমন দপ্ করে ওঠে প্রদীপটা নিববার আগে। সে চেষ্টা করে পোড়াবার, পারে না। গোটাকতক উপোস দিলে ওদের অবস্থাও শেষ-জ্বলা পিদীমের মত হবে। জ্বলবে—তবে শেষবারের মত।

উপানন্দ বলে, যাই বল দাদা, দু-এক জনকে দিলে—

—কমে না? কিন্তু একবার গন্ধ ছুটলে রক্ষা আছে! দানের সৌরভ অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়, লাটসাহেবের গদী পর্য্যন্ত গেলে রায়সাহেব খেতাব জুটিয়েও দেয়। তা আমি চাই না।

উপানন্দর মনটা কোমল। গোপনে ভিখারীটাকে খিড়কি-দুয়ারে বসাইয়া কিছু পান্তা ভাত আনিয়া দিল।

নন্দর কথাটা মিথ্যা নহে। পরদিন খিড়কিতে জন তিনেক ভিখারীর আবির্ভাব হইল। তাহাদের করুণ কণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া উপানন্দ দরজা খুলিতেই একজন বলিষ্ঠ চেহারার ভিখারী হাত তুলিয়া আনন্দের আর্ত্তি তুলিল, জয় হোক বড়বাবুর।

—আমি ত বড়বাবু নই।

—যে দেয় সেই বড়। জয় হোক বড়বাবুর।

—রোজ রোজ লুকিয়ে খেয়ে যাচ্ছ—দাদা জানলে কিন্তু—

—ভগবান আপনার ভাল করবেন, তাঁর রাজত্বে একগুণ দিলে চারগুণ হয়।

—তা হয় না। তোমায় এক সের চাল দিলে এক সের কমবে না আমার?

—না বাবু, ভগবান তা পুরিয়ে দেবেনই—এক দিক না-একদিক দিয়ে।

—আচ্ছা, আজও ভাত দিচ্ছি, কাল আর—এসো না।

সাতদিন পরে বড় বধূ বলিল,—ঠাকুরপো, কাল গোলায় লাঠি নামিয়ে উনি চাল মাপবেন, যদি ধরে ফেলেন?

—ইস্, গোলায় লাঠি দিয়ে ঠিক করা সোজা নাকি। বিশ মণের মধ্যে আধ মণ ঠাহর করা চাট্টিখানি কথা নাকি?

শেষ পর্য্যন্ত লাঠি নামাইতে হইল না। প্রতিবেশী হারু আসিয়া বলিল, দাও না দাদা—পালি দুই চাল ধার।

নন্দ কঠিন কণ্ঠে কহিল, শুধবে কিসে?

—যদি বেঁচে থাকি—

—যদি! নন্দ সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

জীবন-মরণের কথা কিছু বলা যায় না দাদা। হারু শুষ্কমুখে উত্তর দিল।

তাই ত বলছি—কেন ধারটা নিয়ে মরবে। চালের হিসেবে পিঠের ছাল থেকে খুঁটে নিলে হাড়-ছাড়া কিছু থাকবে কি কাঠামোতে?

—সে কথা আমি ভাবছি না।

—তা জানি, আমিই ভাবছি।

—আজ তিন দিন আধপেটা খেয়ে আছি।

—মিথ্যা কথা। যতক্ষণ ঘরে থাকে—কেউ আধপেটা খায় না। দুর্ভিক্ষের দিনেও না। খিদের কাছে সঞ্চয়ের কোন দাম আছে?

—নেই বলেই ত—

—যাও, বকিও না।

—দাদা, চাল যদি নেহাৎ না দাও ত খাতায় নামটা টুকে নাও। খিড়কী-দুয়োরে বসেই খেয়ে যাব না হয়।

—মানে?

—উপানন্দ-ভায়াকে জিজ্ঞাসা কর। না খেতে পেলে মান-অপমান কি। দোহাই দাদা, নামটা টুকে নিও, কালই আসব না হয়।

উপানন্দকে ডাকিয়া নন্দ বলিল, এর মানে?

—মানে! মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঢোঁক গিলিতে গিলিতে উপানন্দ বলিল, যা কাঁদে—দেখলে কষ্ট হয়।

হুঁ—চর্চ্চা রীতিমত হচ্ছে। ভগবানের গোলায় পুণ্যির রসদ বাড়ছে—উঠোনের গোলায় কতখানি কমেছে জানা আছে?

—ওতে কিছু যাবে না একগুণ দিলে—

—এক গুণই কমে। অকালের দিনে চার গুণ—আট গুণ। বদ স্বভাব ছাড়।

উপানন্দ মরিয়া হইয়া বলিল, আমি সইতে পারি না।

—বেশ, নিজের ভাগ থেকে দিয়ো।

—কেন, আমার ভাগ দিতে পারি নে? দিলে দোষ কি?

—উপোস করে থাকতে পারবে?

—উপোস করতে যাব কোন দুঃখে? জমিতে যা ফসল হয়—

ওঃ—ফসলের ভাগ! লক্ষ্মীর মাথায় করাত বসাতে চাও? এই দুর্ভিক্ষের বাজারে?

—তুমি কঠিন হয়েছ বলেই—এই ব্যবস্থা।

—বেশ ভাই তাই হবে। জানবে একবার যা ছাড়বো হাজার মিনতিতে তা ফিরে আসবে না। তুমি যদি না খেতে পেয়ে সামনে উপোস দিয়ে মরে যাও—তবুও না।

উপানন্দ রাগ করিয়া বলিল, বেশ।

তার পর যথারীতি জমি ও গোলা ভাগ হইয়া গেল। অদূরের চণ্ডীমণ্ডপ হুঁকোয় ভড়র ভড়র শব্দে মুখরিত হইল, অন্দরের দুয়ারে ভিখারীদের জয় কোলাহল। কোলাহলটা যতই বাড়ে—হুকার শব্দ ততই প্রবল হইয়া উঠে। নন্দ মাঝে মাঝে কাসিয়া—লাঠি ঠুকিয়া কলিকা পাল্টাইয়া দিবার জন্য চাকরকে ডাকে। এদিকের কোলাহল নিবৃত্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত ওদিকের কলিকায় আগুন জ্বালাইয়া রাখা চাই। শব্দের বদলে শব্দ।

তার পর যথারীতি ওদিকের গোলা নিঃশেষিতপ্রায় হইল।

ছোট বধূ এক দিন উপানন্দকে বলিল, হাত কমাও—গোলায় এক ছটাক ধান নেই।

—বড় জালা ছটোয় ?

ওই ত সম্বল। সামনের কটা মাস কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঠেলতে হবে তো ?

—সাম্‌'নর কটা মাস ! বাংলার পক্ষে দুর্যোগের মাস, না ?

—পাঁজিতে তাই লিখেছে।

—লিখুক। ক-মণ চাল আছে ঠিক ক'রে বলত ?

—মণ ছয়েক হবে।

—তবে কালও চলুক।

—কিন্তু ভেবে দেখ।

—কি ভাবব ? যারা চেঁচায় দুয়োরে এসে—তারা ভাববার অবসর দেয় নাকি ?

—তুমি একা কি করবে ?

—আমার দেখে আরও পাঁচজন এগিয়ে আসবে।

—কই, দেড় মাসের মধ্যে—কাউকে ত দেখলাম না।

—দেখবে। কাগজে অনেক লেখালেখি হচ্ছে।

—বট্‌ঠাকুর নাকি চাল সব বেচে দিচ্ছেন।

—পাগল !

—হাঁ গো, রোজ টাকার শব্দ শুনি।

—টাকা ! সাধ ক'রে বলি পাগল ! কাগজ বাজে নাকি।

—টাকাও আছে—সত্যি।

—তা হলে রূপো জমাচ্ছেন দাদা। টের পেলে ওর শাস্তি জান ?

—টের পাবে কি ক'রে ?

—না, না, তাই বলছি। কিন্তু ওসব বেশিদিন সয় না ছোট বউ। ওঘরে বাজছে টাকা—এ-ঘরে বাজছে উপবাসী ছেলের কান্না। ও-মরাইয়ে লক্ষ্মী হাসছেন—এ পাড়ায় ধুচুনি হাতে ঘরের বউ বেরিয়েছেন ভিক্ষেয়! তবু সংসার চলছে!

—তাই ত চলে। ছোটবউ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

জগৎ এক ভাবেই চলে। উপানন্দকে দানের নেশায় পাইয়া বসিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ছোটবউ একটা বড় জালা ঘুঁটের স্তূপের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। ভিখারীর জয়ধ্বনিতে উপানন্দ রান্না-ঘরে আসিয়া বলিল, আজ রাঁধ নি?

—কাল বলি নি ঘরে চাল নেই?

—কিছু না?

—পঞ্চাশ জনকে খাওয়াবার মত চাল নেই?

—আমাদের জন্য যা রেখেছ?

—ক-জনের মুখে দেবে! লাভে হতে নিজেদের উপোস।

—আচ্ছা আসছি আমি, তুমি বড় উনুনটা জ্বালাবার ব্যবস্থা কর।

তামাকের ধূমে চণ্ডীমণ্ডপ আচ্ছন্ন। নিমীলিত চক্ষে নন্দ তক্তা-পোষের উপর বসিয়া তামাক টানিতেছে। উপানন্দের পায়ের শব্দটা মৃদু নহে—তথাপি নন্দ চক্ষু চাহিল না।

—দাদা।

—বল। যেন উপানন্দ প্রত্যহই আসিয়া থাকে।

—চাল দেবে এক মণ?

—চাল! কাঙালী ভোজনে—না ভূত ভোজনে? চাল নেই।

—অমনি নেব না—টাকা দেব।

—বাজারের দর জানিস্?

—জানি, তাই দেব।

—দয়ার পুকুর! সাগর বলে আর একজন মহাপুরুষকে আর অপমান করলাম না।

—করলেই পারতে। তোমার আর বাধা কি!

—আমাব বাধা আমিই। তাঁদের ওজন জ্ঞান ছিল—তেমনি চলতেন। তেমনি চলার মত মনের জোরও ছিল। নদীর জল নিয়ে খেলা ভাল নয়। বিশেষ করে বর্ষার নদী—বাঁধের কানায় কানায় যার জল।

—কথা থাক্, কত দাম চাও?

নন্দ এতক্ষণে চক্ষু চাহিল। কহিল, তোমাব টাকার আশায় আমি বসে নেই। ধান গেছে মহাজনের গোলায়। লক্ষ্মী বসেছেন ব্যাঙ্কের খাতায়।

—তুমি দেবে না? সেই বেচলে—আমাকে দিলে কি ক্ষতি হ'ত?

—অনেক। আর কিছু বলবে?

—না। উপানন্দ চলিয়া যাইতেছিল।

নন্দ বলিল, শীঘ্রই শহরের বাসায় যাব ভাবছি।

সহসা উপানন্দ নন্দর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল, আমি জানি তোমার অনেক চাল এখনও মজুদ আছে। আজকের মত আমার মান বাঁচাও।

নন্দ কঠিন কণ্ঠে বলিল, আমার রীতি আর নদীর রীতি এক। যা ত্যাগ করি তা ফিরে পেতে চাই নে।

উপানন্দ সবেগে উঠিয়া কহিল, আচ্ছা।

উপানন্দ চলিয়া গেলে নন্দ বাড়ির মধ্যে গিয়া ডাকিল, বড়-বউ ?

—কি গা ?

—বাপের বাড়ি যাবে ? আরে অবাক হয়ে গেলে যে ! বৰ্দ্ধমান —বৰ্দ্ধমান।

—আজ—

—যেতে হলে আজই যেতে হবে—নইলে যাওয়া হবে না।

—কিন্তু—

—গাড়ি তৈরি করতে বলে দিই। চারখানায় সব বাক্স ট্রাঙ্ক বিছানা ধান ধরবে তো ?

—অত লটবহর নিয়ে—

হাসিয়া নন্দ বলিল, যা যাবে সঙ্গে—তাই উঠবে অঙ্গে। তোমাদের ডাকপুরুষের কথা—সামান্য বদল করেছি। নাও, গুছিয়ে নাও।

রাত্রিতে বৃষ্টিটা চাপিয়া আসিল। এঁটেল মাটিতে পা রাখা কঠিন। তবু সেই দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া কত লোক বাঁধ দেখিয়া গেল। জল বাঁধের কানায় কানায়। দুরন্তপনায়—কখনও তার গায়ে ধাক্কা মারিতেছে —কখনও কখনও ছলাৎ করিয়া কাঁধে চাপিতেছে। শক্ত মাটি বৃষ্টির জলে ভিজিয়া নরম ময়দার তালটির মত হইয়াছে। ওপারের জলের ধাক্কাকে যত না ভয়—উপরের বর্ষণকে তার চেয়ে অবিশ্বাস। জল চোঁয়াইলে বুঝা দুষ্কর।

রাত্রি বাড়িলে বাঁধের মুখে ক্ষুদ্র একটি আলোর রেখা দেখা গেল। মালকোঁচা মারিয়া একটা কালো মত লোক হেঁট হইয়া বাঁধের পাশে কি করিতেছে বোধ হইল। হাতে তার সূচ্যগ্র বাখারি। আলোটা

আর জ্বলিল না। জ্বলিলেও উপরের রাস্তা হইতে ব্যাপারটা অনুমান করা দুঃসাধ্য হইত। বাঁধের অবস্থা বুঝিয়া লোকটি হয়ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সংস্কার-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে!

একবার বিদ্যুৎ চমকাইল। কড় কড় শব্দে কোথায় বজ্রপতন হইল। বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল, লোকটি বাঁধের এ পিঠে প্রায় শুইয়া পড়িয়াছে। পিঠের ও হাতের পেশী তাহার ফুলিয়া উঠিয়াছে। বাখারির অবশিষ্টাংশ তখনও ভিজা কাদার উপর ছপাৎ ছপাৎ শব্দে আপ্‌সাইয়া পড়িতেছে।

সকালে দেখা গেল—চারিদিকে জল থৈ-থৈ করিতেছে। গ্রামের চিহ্ন নাই, মাঠের চিহ্ন নাই, শস্যাঙ্কুরের শ্যামলতা মুছিয়া গিয়াছে। দৌরাত্ম্যশীল লক্ষ তরঙ্গ-বাহুতে আঁকড়াইয়া দামোদর বাঁধের মাটি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। মুক্তিপাগল দানবটা হুহুঙ্কার শব্দে মাঠের পর মাঠ—গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া ছুটিতেছে। দুই ধারে উঠিতেছে মরণ আর্ত্তনাদ, মুক্তির জয়ধ্বনিতে তাহাও ধ্বনিহীন।

শহরের রাস্তায় ভাল করিয়া আলো জ্বলে না। নিষ্প্রদীপ শহর। ইহাতে শহরের রূপটি বুঝা যায় না, অনেক কুশ্রীতাও ঢাকা পড়িয়াছে। সৌধের ছায়ায় কুটীরের দীনতা তেমন ফুটিতেছে না। মোটরের পাশে ময়লা কাপড়পরা ভিখারী দাঁড়াইলে আলোর স্বল্পতায় তাহার দীন বেশটি চোখে আঘাত করে না। ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া ক্ষুধার তাড়নায় কোন্ ভাঙা ঘরে কাহার ছেলে কাঁদিতেছে—অন্ধকার তাহাও বুঝিতে দেয় না।

দ্রৌপদীর সম্ভ্রম রক্ষাকারী শ্রীকৃষ্ণের মত অন্ধকার দুর্গত জনকে প্রতি রাত্রিতে ত্রাণ করিতেছে। তাহারা কৃতজ্ঞ বইকি!

একটি দ্বিতল বাড়ির নীচেয় নিষ্প্রদীপের অন্ধকারে একটি দুর্দ্দশাগ্রস্ত কুটীর আত্মগোপন করিয়া ছিল। ভিতরে যাহারা ছিল—তাহাদের কণ্ঠস্বর ক্লিষ্ট। ছেলেরা ক্ষীণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া ঘুমাইয়াছে—অর্থাৎ নিশ্চেতন হইয়াছে, বয়স্কেরা আলাপ করিতেছে।

স্ত্রী বলিল, বট্‌ঠাকুর চালাক, নিজের সর্ব্বস্ব বাঁচিয়ে সরে পড়লেন। এক মণ চাল বাছাদের জন্য রেখেছিলাম—গেল জলের গর্ভে।

—গরীবকে বঞ্চিত ক'রে রাখলেই যায়।

—তবে বট্‌ঠাকুরের কেন গেল না? ও সব অদৃষ্ট।

—কার?

—আমাদের। ভগবানের মার না হ'লে দামোদরে বান আসবে কেন?

—ভগবান! পুরুষ হাসিল।

—ভগবান নয় ত মানুষ নাকি? স্ত্রীকণ্ঠে বিরক্তির ধ্বনি।

পুরুষ কথা কহিল না। বাতাসে ভাজা তরকারীর গন্ধ ভাসিতেছে। দুই দিন নিরম্বু উপবাসীর নাসিকায় তাহা মারাত্মক। পেটের ভিতর কয়েকটা ভীমরুল এক সঙ্গে হুল ফুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

পুরুষ সজোরে নিশ্বাস টানিতে টানিতে বলিল, শাস্ত্রকাররা মিথ্যে বলেছেন। এত নিশ্বাস টানছি অন্তত আদ্দেক পেটও যদি ভরত! আর মানুষের দুর্ভোগ ভগবান ঘটান না। ঘটিয়ে তাঁর লাভ?

—লাভ তাঁর নয়, মানুষের পাপ।

—কাল ভিক্ষেয় বেরুব। ওরা রোজ মাছ-মাংস খেতে পায়,

আমরা এক মুঠো ভাতও পাব না? এক মুঠো ক্ষুদ সেদ্ধ? কি এক সরা ফ্যান?

বন্যার কলরোলকে ছাপাইয়া এই স্বর প্রবল হইতেছে বুঝি?

কিন্তু কোথায় বন্যা কোথায় বা কি! কাগজে বন্যার কথা পড়িতে পড়িতে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। ঠাকুর আহারের জন্য ডাকিতেছে। মাংসটা আজ ভালই উৎরাইয়াছে সুঘ্রাণে বুঝিতেছি!

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে এক ক্ষুধার্ত্ত ভিখারীর করুণ কণ্ঠ কানে গেল, আজ দুদিন খাইনি বাবা। আমার বাছাদের মুখ চেয়ে এক মুঠো ভাত দাও, না-হয় একটু ক্ষুদ সেদ্ধ কি একটু ফ্যান?

ও পাশ হইতে অনিলবাবু বলিলেন, এখন নয়—এখন নয়। ঠাকুর দুয়োরটা বন্ধ কর। খাবার সময় যত সব—

নীতি-কথা

প্রত্যহ প্রাতঃকালে অন্ততঃ মিনিট দশেক বাড়ির ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিছু পড়িয়া শোনানো অথবা সৎ উপদেশ দেওয়া আমার অভ্যাস। গৃহিণীর কাছে এই নীতি-প্রচার মূল্যহীন; ছেলেমেয়েরাও যে খুব আগ্রহের সঙ্গে শোনে—তাহা নহে, তবু নীতি-কথার মধ্যে গল্পাংশ তাহাদের ভাল লাগে। ভাল ছেলেমেয়ে হইবার লোভ এবং লজেঞ্জ, বিস্কুট প্রভৃতির উপহারও এ বিষয়ে আমাকে খানিকটা সাহায্য করে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী পড়িতেছিলাম। দরিদ্রের মধ্যে কি ভাবে নারায়ণকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন....দুয়ারের গোড়ায় কে মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, আজ দু'দিন খাই নি, মা, কিছু প্রসাদ দেবেন।

ছেলেমেয়েরা ভিখারী দেখিতে ছুটিয়া বাহিরে গেল।

প্রসাদ! বত্রিশ টাকা মণ চাউলের প্রসাদ বিতরণ করা আমার মত অল্প আয়ের সাধারণ গৃহস্থের সাধ্যে কুলায় কি? পঞ্চাশের বিভীষিকা বাংলা দেশকে রীতিমত আচ্ছন্ন করিয়াছে। ঘরের সঙ্গে পথের ব্যবধান ঘুচিয়াছে; সে প্লাবনে গ্রামস্থ সমাজ ভাসিতেছে, আচার-বিচারের নিষ্ঠা শিথিল হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার মুখে। মানুষ পতঙ্গের মত এই দুর্য্যোগের সুযোগে পাখা মেলিয়াছে—আয়ুর চিহ্নিত রেখায় —তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বদ্ধ। দেখিয়া সাবধান হইবার কথা কে ভুলিতে পারে? অন্ততঃ আমার মত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা ত নহে।

মেয়েদের মন স্বভাবতই নরম। যতক্ষণ ঘরে এক কণা ক্ষুদ থাকিবে—ততক্ষণ দয়া বৃত্তিকে ফল্গুধারার মত বহন করিবেই। বইখানা বন্ধ করিয়া গৃহিণীকে কিছু সদুপদেশ দিলাম।

তিনি উপেক্ষাভরে কহিলেন, যে আনছে নিচ্ছে সেই বুঝুক, আমার কি?

ভিখারীর উদ্দেশে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলাম, ওগো, হাত জোড়া—এখন ভিক্ষে হবে না।

চাল নিয়ে কি করব বাবা, দু'টি প্রসাদ দিও।

আব্দার মন্দ নহে। রুক্ষ কণ্ঠে বলিলাম, প্রসাদ কি এই তিন প্রাতঃকালে নিয়ে বসে আছি! সেই যার নাম বেলা দু'টো।

তবে তোমাদের কাঁঠাল গাছের ছেঁয়ায় একটু বসি বাবা।

কি সর্ব্বনাশ! তাড়াতাড়ি কহিলাম, ওগো—বলছি হবে না, তবু কেন দিক্ কর। আরও পাঁচ বাড়ি তো আছে—চেষ্টা দেখ না।

সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, চলবার ক্ষ্যামতাও নেই। পেটভরা চাই না বাবা, এক মুঠো।

হাঁ—এক মুঠোতে মানুষের পেট ভরে! যত সব—

কিন্তু আমার বিরক্তিতে সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। দরজার বাহিরে এক টুকরা জমিতে একটা পত্রবহুল কাঁঠাল গাছ ছিল—তাহারই ছায়ায় শুইয়া পড়িল।

স্ত্রীলোক। শুষ্ক-শীর্ণ বিবর্ণ দেহ। সত্যই কি ইহার গৃহ ছিল? এ রূপে আকৃষ্ট হইয়া কোন পুরুষ কোন দিন গৃহ বাঁধিবার কল্পনা করিয়াছিল কি করিয়া—কে জানে। আমার বাড়ির কুকুরটা উচ্ছিষ্ট খাইয়া যে যৌবন-শ্যামলতা লাভ করিয়াছে···মানুষকে দেখিয়া করুণা হয়, এবং ঘৃণাও জাগে। একবার ওই গৃহহারা—স্বামীপুত্রহারা অনাথিনীর জন্য মনটা ঈষৎ আর্দ্র হইয়া উঠিতেছে, পরক্ষণেই দারুণ বিতৃষ্ণায় ওদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতেছি। মরণের আমন্ত্রণ ও এখনও অগ্রাহ্য করিয়া আছে কেন? ওর ধূলিরুক্ষ জটাজালে—

কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষুতে—গণ্ডাস্থিপ্রকটিত মুখমণ্ডলে যে ইঙ্গিত পরিস্ফুট—তাহা কি ও বুঝিতেছে না। স্বীকার করিলাম, নম্র স্বভাবের মেয়েরা সবকিছু শেষ পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া যায়, কিন্তু আত্মমর্য্যাদার কত নিম্ন স্তরে নামিলেও সেই সহনশীলতার ব্যত্যয় ঘটে না। মর্য্যাদা বা মান অপমান বুঝি গৃহের চারিটি দেওয়ালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, বুভুক্ষু পৃথিবীর বহিরাঙ্গনে তা অকিঞ্চিৎকর।

বেশিক্ষণ ভাবিতে পারিলাম না, ছোট ছেলে একটা বোতল হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, বাবা, শা'দের দোকানে কেরোসিন তেল দেবে আজ, আনব?

নিশ্চয়। কত করে দিচ্ছে রে?

চার পয়সাব।

মোটে! তাহ'লে তুই একলা গিয়ে কি করবি। মণ্টু, পুটি, খেঁদি, পটলা সবাইকে নিয়ে যা।

ছোট ছেলে নাকি সুরে বলিল, বড়দা বললে এখন মাষ্টার-বাড়ি যাবে।

দুত্তোর মাষ্টার-বাড়ি! আগে তেল না আগে পড়া? বলি তেল না থাকলে আলো জ্বলবে কি আমার মাথা দিয়ে?

আমার ক্রোধ দেখিয়া ছেলেটি প্রথমত থতমত খাইয়া গেল, পরে মুখভাব তাহার প্রফুল্ল হইল। বড়দার নামে আর এক দফা নালিশ রুজু করিল, জান বাবা, পরশু সকালে মল্লিকদের দোকানে চিনি দিচ্ছিল, আমরা সবাই গেলাম, বড়দা গেল না।

তা যাবেন কেন, চা খাবার বেলা তো গরহাজির দেখি না। ছেলেটা দিন দিন পাজী হচ্ছে।

আমার উচ্চ কণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া গৃহিণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কাকে বকছ গা ?

মণ্টুকে। শুনলাম—পরশু চিনি দিচ্ছিল—ও নাকি কিছুতে যায় নি।

যাবে কোত্থেকে—পড়ছিল। চাল রে—চিনি রে—কেরোসিন রে—নুন রে—সারা দিন দিন হৈ হৈ করে তো ওদের কাটে। লেখাপড়া শিখে মানুষ আর হতে হবে না।

মানুষ! কথাটা মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল, মর্ম্ম স্পর্শ করিল না। তের শত পঞ্চাশের ঘূর্ণাবর্ত্তে অনেক ভাল কথাই তো মনে ঠাঁই পাইতেছে না।

ছোট ছেলেটির পানে ফিরিয়া গৃহিণী কহিলেন, বলি এটারও মাথা খেতে হবে নাকি ? দ্বিতীয় ভাগখানা কিনে পর্য্যন্ত তো পাতা উল্টালে না।

মানুষ বাঁচলে তো লেখাপড়া! শা'দের দোকানে কেরোসিন দিচ্ছে নাকি।

পোড়াকপাল তেলের! চার পয়সার তেল বোতলের তলায় পড়ে থাকে। ময়লা। মুখভঙ্গী সহকারে তেলের অকৃত্রিমতাকে এবং দোকানীর সাধুতাকে ধিক্কার দিয়া তিনি ডাকিলেন, ওরে পুঁটি, খেঁদি, পটলা—ইদিকে আয়।

খেঁদি উত্তর দিল, রান্নাঘর পরিষ্কার করছি।

মর ছুঁড়ি, ওসব রেখে ইদিকে আয়। কেরোসিন না হ'লে তোর চুলো ধরাব কি দিয়ে। ভিজে কাঠে এই সত্যিকার এতখানি তেল লাগে।

বিস্মিত কণ্ঠে কহিলাম, বল কি, কাঠের ফুল্‌কি—কি কাগজ—

ফুলকি আজকাল ছুতোররা দেয় কি না। কাগজ? বলি কাগজের ঠোঙায় কত জিনিষপত্তর আসছে শুনি ?

দুই-ই দুষ্প্রাপ্য। অতএব খেঁদি-পুঁটি-পটলার বাহিনীকে তৈল সংগ্রহে নিযুক্ত না করিলে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার হইতে লেখাপড়ার ব্যাপার পর্য্যন্ত বন্ধ।

দুই মেয়ে ও সেজ ছেলে আসিল।

গৃহিণী বলিলেন, কোথায় নাকি তেল দিচ্ছে—সব বোতল আর পয়সা নিয়ে যা। মণ্টু কোথায়?

বড়দা তো পড়তে গেছে।

কি একটা শক্ত কথা বলিতে গিয়া তিনি আত্মদমন করিলেন। তা থাকগে—তোরা যা।

খেঁদি বলিল, বোতল কোথায় এত?

সবাইকে বোতল নিতে হবে এমনই বা কি কথা! যুদ্ধের বাজারে বোতল শস্তা নাকি?

যথাক্রমে কলাইয়ের চটা-ওঠা গ্লাস, পিতলের ঘটি, একটি আস্ত এবং একটি গলা-ভাঙ্গা বোতল হাতে লইয়া ছেলেমেয়েরা উঠানে দাঁড়াইল।

গৃহিণী বলিলেন, দাঁড়ালি যে?

খেঁদি নাকি সুরে বলিল, এই ছেঁড়া প্যাণ্ট পরে যাব নাকি?

না তো তোমার জন্মে ফুলপাড় শাড়ী এনে দিই। বলি একি নেমন্তন্ন খেতে চলেছিস?

মায়ের শাসনে মেয়ের শালীনতাবোধ বিলুপ্ত হইল। ক্ষুণ্ণ অভিমানে অন্য ভাইবোনগুলিকে অনুসরণ করিয়া বাগান পার হইয়া পথে পড়িল।

তা খেঁদির বয়স এগারো ছাড়াইয়াছে। পাড়াগাঁয়ে থাকে এবং তেমন যত্নও পায় না; গড়নটা ক্ষয়াটে ধরণের। বাড়িতে ঝি নাই, কাজের অনেক তাল ঐ কিশোরী মেয়েটির উপর

গিয়া পড়ে। কাজেই—না প্রসাধনে—না হাসি-খুসি-খেলা-ধুলায় যৌবনের কৃপণ কিরণটুকু উহার মুখে পড়িয়া রংটাকে ঈষৎ উজ্জ্বল করিতে পারিয়াছে। কিন্তু সচ্ছল অবস্থার আরও পাঁচটি মেয়ের সঙ্গ ও পায়। কল্পনায় মনের মুকুলে তাহার অনাগত বসন্ত বায়ুর দোলা লাগে হয়ত। কিন্তু পাঁচ টাকা দামের একখানি আটপৌড়ে শাড়ী দিবার সামর্থ্য আমার নাই, প্যাণ্টেই কাজ চলিতেছে। শাড়ী অবশ্য একখানি আছে, কোথাও নিমন্ত্রিত হইলে সেখানি অঙ্গে উঠে। অন্যথায় বাড়ির ফায়ফরমাস খাটিয়া বাহির হইবার অবসরই বা কোথায়? তবে বয়স সম্বন্ধে মেয়ে যে ক্রমশঃ সচেতন হইতেছে তাহা ওর এই অভিযোগ-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠস্বরেই বেশ বুঝিতেছি। মনে মনে বলিলাম, যুদ্ধটা থামুক আগে—

সে কল্পনারও অবশ্য কূলকিনারা নাই। কবে যে থামিবে এই পৃথিবীব্যাপী মহাসমর!

কাঁদিতে কাঁদিতে পটলা ফিরিয়া আসিল। হাতে তাহার গলাভাঙা বোতলের টুকরা—হাতে ও বুকে ছড়িয়া গিয়া রক্ত গড়াইতেছে।

—কি রে, কি হ'ল?

ক্রন্দনের আবর্ত ঠেলিয়া তাহার কণ্ঠস্বর শুনা গেল, দেখ না বাবা, ওদের পুলিন আমায় এমন ঠেলে দিলে—

তা ঠেলাঠেলি করিস কেন? প্রশ্ন করিয়াই কিউ-অজগরের অবয়বটা মনশ্চক্ষে প্রকটিত হইল। বয়োবৃদ্ধেরা যেখানে ঠেলাঠেলি, গালাগালি, মারামারি করিয়া দ্রব্য সংগ্রহ করে সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে শৃঙ্খলা রক্ষার আশাই তো অন্যায়।

তৈল সংগ্রহ করিয়া ছেলেমেয়েরা পুনরায় বাহির হইতেছে—গৃহিণী বলিলেন, আবার কোথায় চললি সব?

পুঁটি বলিল, চিনি দিচ্ছে মা।

তা পয়সা নিয়ে যা। এ ঘরে আসিয়া বলিলেন, পয়সা দাও তো। চারটে দু'আনি দিও।

কেন, একসঙ্গে চার জনের দাম দিলে চলবে না ?

খেঁদি বলিল, এক বাড়ি থেকে চার জনকে দেবে কিনা। আলাদা বাড়ি বলে নিই—তবে তো দেয়।

তবে তুই বরং একটা টাকা ভাঙিয়ে নিস, অনেক বেজকি তো ওরা পায়।

টাকার পয়সা দেয় না।

তাহলে মুশ্‌কিল। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে মোটে পাঁচ আনা হয়।

গৃহিণী বলিলেন, ঠাকুরের মানত বলে সেদিন খোকার কপালে পাঁচটা পয়সা ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, তাই থেকে দেব কি ?

তা দাও।

কিন্তু ঠাকুরের পয়সা—আজই পুরিয়ে রাখতে হবে বলে দিলাম।

বলিলাম, গোদের ওপর এই এক বিষফোড়া জুটেছে। পয়সা আধলা তো উবে গেল—সিকি দুয়ানিও পাওয়া যাচ্ছে না। এই যুদ্ধই আমাদের মারবে।

গৃহিণী বলিলেন, পোড়া যুদ্ধু কবে মিটবে গা ?

—যুদ্ধই জানে, মানুষ জানে না।

—তা যে মুখপোড়া এই কাণ্ড বাধালে তাকে ধরে জেল-ফাঁসি যা হয় দিক না।

—সেই মুখপোড়ার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না যে।

মরণ! ঠাকুরের মানত পয়সা আনিয়া তিনি খেঁদির হাতে দিলেন।

পটলা বলিল, আমি যাব।

না না, তোর বুক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

ছেলে শুনিল না।

চিনির সের আট আনা। প্রত্যেককে এক পোয়া করিয়া চিনি দিবার কথা। দিয়াছিলাম ছ'আনা, কিন্তু খেঁদিরা চার জনে মিলিয়া এক সের চিনি আনিয়াছে।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ রে, আর এক পোয়ার দাম কোথায় পেলি?

খেঁদি পিতলের ঘড়ায় চিনি ঢালিতে ঢালিতে বলিল, কেন, অসীমরা যেমন করে পেলে—আমরাও তেমনি করে পেলাম।

পটলা বলিল, বাবা, বড়দি মেজদি ওরা দু'বার করে চিনি নিয়েছে।

পুঁটি বলিল, বড়দিতে আমাতে চিনি নিয়েই ময়রা দোকানে বেচে দিলাম। ওরা এক পোয়া চার আনা করে দিলে।

—বলিস কি?

—কেন—সবাই তো বেচছে। অসীমরা, দীপালীরা, দেল-জানেরা—

পটলা বলিল, দিদি দু' আনা পয়সা নিয়েছে বাবা। আমাদের বললে, খাবার খাবি আয়।

খেঁদি প্রতিবাদ করিয়া বলিল, বাঃ রে, ময়রা বললে—দু-আনার খাবার নাও খুকি—আর খুচরো পয়সা তো নেই। তাই না—

পটলা বলিল, আমায় মোটে একখানা জিলিপি দিয়েছে বাবা।

স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। যুদ্ধ যেমন বিজ্ঞানকে আগাইয়া দেয়, মানুষকেও নানা দিক হইতে সচেতন করিয়া তুলে। অকাল-অভিজ্ঞতা অলক্ষ্যেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সংসার চিনাইয়া দিতেছে। কেরোসিনের আস্ত টিন—যাহা কালো বাজারে কিনিয়াছিলাম—অস্পর্শিত আছে; ছেলেমেয়েদের সারল্য, সততা ও ভবিষ্যৎ ভাঙাইয়া এই সংগ্রহ চলিতেছে। টাকা ধার করিয়া কিছু চাল ঘরে রাখিয়াছি; কারণ না খাইয়া পথে মরার দৃশ্যটা যত করুণ হইয়াই চোখে আঘাত করুক—মনকে ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় মুহ্যমান করিয়াছে তার চেয়ে বেশি। এখন যেন-তেন-প্রকারে বাঁচিয়া থাকাটাই জীবনের উদ্দেশ্য হইয়াছে, জীবনের মহত্ত্ব-সতত্ব ওসব যুদ্ধ পরবর্ত্তী যুগের জন্য।

—ও মহী—মহী আছিস নাকি?

অতীন—আয়। বাল্যবন্ধু অতীন চায়ের কাপ হস্তে ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, একটু চিনি দে তো ভাই, নইলে সকালের নেশা জমছে না।

চিনি!

হাঁ রে, এই তো তোর ছেলেমেয়েরা আনছিল দেখলাম। বেশ ঝানু ছেলেমেয়ে! দে আধপোয়াটাক।

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রতিবেশী এবং বাল্যবন্ধু। এবং বহু সময়ে বহু ভাবেই ওর দ্বারা উপকৃত আমি। চিনি দিলাম—ঈষৎ অপ্রসন্ন মনেই।

অতীন যেন আমার মনোভাব বুঝিয়াই হাসিয়া বলিল, ভয় নেই, ওবেলা তোর চিনি শোধ দিয়ে যাব। বুঝি তো যুদ্ধের বাজার।

ওর হাসিটা তীরের মতই বুকে আসিয়া বাজিল।

সরিষার তেলের বাটিটা লইয়া তেল মাখিতেছি—গৃহিণী বলিলেন,

ওগো—অত করে তেল মেখো না—এক পোয়া তেলের দাম সাড়ে পাঁচ আনা।

তবে একটু নারকেল তেল দাও মাথায় মাখি।

নারকেল তেল? ক'মাস আন নি হিসেব আছে! এই দেখ সরষের তেল মেখে মেখে মাথায় জটা পড়ে গেল।

রহস্য করিয়া বলিলাম, তা ভাল; প্রব্রজ্যা নেবার রাস্তা সহজ হয়ে আসছে।

তোমার রসিকতা ভাল লাগে না, বলে যার জ্বালা সেই জানে। মুখ ঘুরাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

জানি—এই সঙ্কট সময়ে রসিকতা কেহই পছন্দ করিবেন না, কিন্তু বৃদ্ধ বিধাতাপুরুষ আমাদের অসহায় অবস্থার সুযোগে খুব একচোট রসিকতা করিতেছেন না কি!

আহারাদি শেষ হইলে বিছানায় আসিয়া শুইলাম। বড় মেয়ে দু'টি পানের খিলি ও একটু চূণ তর্জ্জনীতে মাখাইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

পান মুখে দিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলাম, মুখপুড়ি গুচ্ছেক খয়ের দিয়ে পান কুইনিন করে এনেছ।

মেয়ে নাকি সুর টানিয়া কহিল, বাঃ রে, খয়েরই তো তেতো। মিষ্টি খয়ের পাওয়া যায় নাকি!

—বেশ বেশ, আর খানিকটা চূণ নিয়ে আয়—সুপুরিও।

মেয়ে চূণ আনিয়া কহিল, সুপুরি আর হবে না, মোটে একটি আছে, মা বললে—দোক্তা খাব কি দিয়ে।

জানালাটা খুলিয়া শুইলাম। কাঁঠাল গাছতলায় তখন ভিখারিনী উঠিয়া বসিয়াছে। মাঝে মাঝে প্রত্যাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের বাড়ির

পানে চাহিতেছে। কোন্ ঘরের মেয়ে কিংবা বধূ ও জানি না—অতিথি যে গৃহস্থের পক্ষে নারায়ণ সে বোধটুকু নিশ্চয় ওর আছে এবং হয়ত ভাবিতেছে, দুর্ভিক্ষের বাজারে নরের মধ্যে নারায়ণকে ভুলিয়া যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের নহে। ভিখারী আসিলে গৃহস্থের হৃৎকম্প হয়—তেমন যুগের কল্পনাও ও হয়ত কোন দিন করিতে পারে নাই। কিন্তু ভিখারীকে দান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার যে নগ্ন চিত্র চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছি—তাহার তীব্র তাপে দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তি-গুলি শুকাইয়া উঠিতেছে ক্রমশঃ। আমরা তো সামান্য প্রাণী ; প্রমত্তা নদীর ধারে উচ্ছে-পটোলের ক্ষেত ভাঙ্গনের মুখে পড়িলে অদূরবস্থিত বৈঁচি ঝোপে যেমন কাঁপন লাগে—উহাদের দুর্দ্দশায় আমরাও তেমনি কাঁপিতেছি।

ভুক্তাবশিষ্ট কিছু ব্যঞ্জন ও অন্ন আনিয়া গৃহিণী অতিথি সৎকার করিলেন। ভিখারী মেয়েটার চক্ষুতে এই একদিন বাঁচিয়া থাকিবার কৃতজ্ঞতা উপচিয়া পড়িতে লাগিল। মরণোন্মুখ বুভুক্ষুর কৃতজ্ঞতা সহ্য করা কি কঠিন!

জানালাটা বন্ধ করিলাম এবং বিবেকানন্দ চরিতখানা বিছানা হইতে তুলিয়া তাকের উপর রাখিলাম।

দুঃস্বপ্ন

হরগোবিন্দ যে এমনটি হইবে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই।

গঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া খানিক বিশ্রাম করিয়া সে আহারের বসে। সেটা অবশ্য বেলা দ্বিপ্রহরে। তাহা হইলেও—অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণ কোন দিন কেহ দেখে নাই। পিত্ত পড়িবার হেতুটিকে সে সমূলে বিনষ্ট করিয়া যায়—সকাল আটটায় গঞ্জে বাহির হইবার মুখে। প্রত্যূষে স্নান সারিয়া ও পিত্ত বিনষ্ট করিবার উপকরণ ছোলাগুড় ও খানকয়েক পরোটা জলযোগ করিয়া বাইকে চাপিয়া দু'মাইল দূরের গঞ্জে প্রত্যহ তাহাকে যাইতে হয়। সেখানে ব্যাপারীদের সঙ্গে, মহাজনদের সঙ্গে এবং ক্রেতাদের সঙ্গে নানাপ্রকার দ্রব্যের দরদস্তুর ও কেনা-বেচায়—এমন নিঃশব্দে বেলা গড়াইয়া চলে যে ক্ষুধার তাড়না অনুভব করার সুযোগ পর্য্যন্ত সে পায় না।

ভাইপো মণি কাকার নিয়মানুবর্ত্তিতার কথা ভালমতেই জানে। খাতার উপর কলমটা মিনিটখানেকের জন্য উদ্যত রাখিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলে, বেলা একটা বাজলো কাকা।

বিক্রেতাদের সঙ্গে বচসা থামাইয়া হরগোবিন্দ বলে, একটা! আচ্ছা। দেখ ভাই, সওয়া ষোল পর্য্যন্ত উঠতে পারি। মর্জ্জি হয় দাও—না হয় অন্য কোথাও দেখ।

হতাশ চাষী বলে, এত বেলা পর্য্যন্ত এটকে রাখলে কর্ত্তা, কোথায় দর পাব বল ত?

হরগোবিন্দ হাসিয়া বলে, মাল না জমলে কখনও বাজার দর ওঠে? তোরা যদি এক কথার মানুষ হতিস আমাদের এত বকতে হয়!

আমাদের মুগ কলুইয়ের দর দেখছ কর্ত্তা—চালের দর—কাপড়ের দর দেখছ না। কি খাই বল ত?

হুঁ, চাষার ঘরে ভাতের অভাব! তোরাই ত রাজা আজকালকার দিনে।

আর দুই পয়সা পর্য্যন্ত দর তুলিবার জন্য লোকটা পুরা পাঁচ মিনিট ধস্তাধস্তি করিতে থাকে। এক পয়সা পর্য্যন্ত উঠিয়া হরগোবিন্দ বাইকটা টানিয়া বাহির করে ঘর হইতে।

দোকানের সামনে বাইক বার করিয়া বলে, মণি, মালটা ওজন করে দাম চুকিয়ে দিও। বারোয়ারির চাঁদা—দস্তুরি বুঝে নিও।

তা বলিতে নাই এমন করিয়া যুদ্ধের বাজারে হরগোবিন্দ দু-পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। কয়েক হাজারের পুঁজি—লাখে দাঁড়াইয়াছে এবং লাখের অঙ্কগুলি দ্রুত ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতেছে।

কোন দেশে বোমা—শেলের ঘায়ে মাটি বিধ্বস্ত হইতেছে, জনপদ-বাসীরা বিদীর্ণ দেহে মৃত্যুবরণ করিতেছে—সে সংবাদ ছাপার হরপে নিত্য পরিবেশিত হইতেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ দুঃখ-দর্শনের দায়িত্ব তাহার মধ্যে নাই বলিয়াই ভয়ঙ্করকে তত দূর হইতে আশীর্ব্বাদ বলিয়াই মনে হয়। হরগোবিন্দের হিসাবে—জনপদ বা মানুষ উৎসন্ন যাওয়ার সঙ্গে তৎপ্রদেশজাত দ্রব্যাদির চাহিদাও সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ হইতেছে। অবশ্য জন বা জনপদের ধ্বংস কামনা সে করে নাই, কিন্তু গুদামজাত দ্রব্যাদি যাহাতে অধিকতর দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হয়—এই প্রার্থনা অহোরাত্র সে করিতে থাকে। যাহা হউক, আজ গঞ্জ হইতে ফিরিয়া তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল।

পরিপাটি পঞ্চ ব্যঞ্জনের পরিবেশিত মিহি চালের সুগন্ধি ভাত থালার শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। গরম গাওয়া ঘি পাতে দিতে আসিলে

হরগোবিন্দ হাত বাড়াইয়া নিষেধ করিল। ঘন দুধের বাটিটাও বাঁ হাত দিয়া সরাইয়া দিল। মাছের মুড়াটার পানে বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, নিয়ে যাও।

বড় মেয়ে বলিল, কেন বাবা, শরীর খারাপ হয়েছে?

—না।

—তবে? নন্দীপুকুরের মাছ—তুমি ভালবাস—

—ভাল লাগছে না, নিয়ে যা।

কোন রকমে আহার সারিয়া হরগোবিন্দ উঠিয়া পড়িল।

দুগ্ধফেননিভ শয্যা। টান মারিয়া সাদা চাদরখানি উঠাইয়া দিল। একটা মাদুর মেঝের উপর পাতিল ও একটা পাশবালিশ ও মাথার বালিশ লইয়া ঘুমাইবার আয়োজন করিল। ঘুম কি কিছুতে আসিবে? গুরু মাধ্যাহ্নিক আহারের আলস্যকে ধরিয়াই না তাহার আবির্ভাব! আজ আহার গুরুতর হয নাই, চিন্তার ভারে আলস্য আত্মগোপন করিয়াছে। খানিক এপাশ ওপাশ করিয়া হরগোবিন্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এর জন্য আমিই দায়ী? এমন ত নয় যে—লোকে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরছে—আর আমার টাকা বাড়ছে দিন দিন। এর আগে কি না খেতে পেয়ে লোক মরত না, না ব্যবসাদারের টাকা বাড়ত না? লাভের অঙ্ক কিছু বেড়েছে বটে, সেটা বাজারের জন্যই। চার গুণ চড়া দাম দিয়ে জিনিষ কিনছি কম ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে? চার গুণ লাভ—ও ত ন্যায্য লাভই। আজ জিনিষের দাম আট-দশ গুণ বেড়েছে বলেই টাকার অঙ্ক ফেঁপেছে। যুদ্ধের আগেও যে টাকার মালিক ছিলাম—হিসাব মিলিয়ে দেখলে—আজও তাই আছি।

কিন্তু এই স্তোকবাক্যে মন প্রবোধ মানিতেছে না। বাইক করিয়া আসিবার পথে বুনো ও দুলে পাড়া পড়ে। সেখানে কোনদিন

নামিবার দরকার হয় না। বড় অশ্বত্থ গাছতলাটায় একপাল উলঙ্গ ছেলে মেয়ে ধূলাবালি মাখিয়া হৈ-হৈ করে, কয়েকটা অতিকায় কুকুর বাইকের আবির্ভাবে ঘেউ ঘেউ শব্দে তাড়া করিয়া খানিক দূর আসে, ভাঙ্গা চালাঘরের দাওয়া হইতে ছিন্নবসনাবৃতা কোন মেয়ে হয়ত মুখ বাড়াইয়া সুবেশ আগন্তুককে খানিকক্ষণের জন্য দেখিয়া লয়। ময়লা রং —ময়লা কাপড়—তৈলাভাবে পিঙ্গল বর্ণের চুল—দেহও প্রায় কঙ্কালসার —সেদিকে চাহিবার প্রয়োজন হরগোবিন্দের কোনদিন হয় না, বরং বাইকটা জোরে চালাইয়া দেয়।

আজকাল ধূলাবালি মাখা উলঙ্গ শিশুর দল বড় অশ্বত্থ গাছতলায় হৈ-হৈ করিয়া খেলা করে না, অতিকায় কুকুরের দল ঘেউ-ঘেউ শব্দে তাড়া করিয়া আসে না। দাওয়ার ছিন্নবসনা প্রেতনীমূর্ত্তিও চোখে পড়ে কম।

তবু ওই গাছতলাটায় আসিয়া হরগোবিন্দ থামিল।

কয়জন শীর্ণকায় লোক—একটা বছরদশেকের ছেলেকে ঘিরিয়া 'হায়' 'হায়' করিতেছে। বিলাপের ধ্বনি উচ্চ নহে, মনকে স্পর্শ করে। অন্তত ব্যাপারটা জানিবার কৌতূহলেই হরগোবিন্দ বাইক থামাইল।

শুধাইল, কি হয়েছে রে?

—আজ্ঞে, কুঞ্জুর ছাওয়ালটা গেল।

—মরে গেল? কেন?

—কেন? এক মুঠো জুটাতে নারলে, আজ চারদিন ভুঁখা। একটু পানি খেয়ে বাঁচে বাবু।

—ওর বাপ কাজ করে না?

—কুথা! দশ আনা মজুরি—গুষ্টিশুদ্ধ খেতে। এক পালি চালের দাম আট আনা। এক কাঠা না হলে চলে?

—ছেলেটার অসুখ হয়েছিল বুঝি ?

—পেটের ব্যামো।

আর একজন বৃদ্ধা মুখ তুলিয়া বলিল, কচু। না খেতে পেলে আমরাও মরবো বাবু। হাঁ বাবু, চাল কি পাওয়া যাবেক না ? আমরা ভুঁখা থাকবো ?

জনতা হরগোবিন্দের পাশে জমিতেছিল। অশ্বথতলায় সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল। ওটা কি নরদেহ না আধপোড়া কাঠ একখানা ধুলার উপর পড়িয়া আছে ? মানুষের দেহ এত কুশ্রী হইতে পারে ? গঠনে নয়—বর্ণে নয়—ওর শক্ত দেহটার আড়ষ্ট ভঙ্গির মধ্যে কঠিন মৌন অভিযোগ এই অবসরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ওষ্ঠ রৌদ্রঝলসিত কচি পাতার মত এলাইয়া পড়িয়াছে—কালো শীর্ণ মুখের সব কয়টি দন্ত সুপ্রকট। চক্ষু কোটরে ঢুকিয়াছে—তবু আধনিমীলিত। অন্নবঞ্চিতের তীব্র অভিযোগের রূপ এমন করিয়া কোন দিন প্রত্যক্ষ করে নাই হর-গোবিন্দ।

তাড়াতাড়ি বাইকে উঠিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। এবং স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একটা টাকা জনতার পানে ছুঁড়িয়া দিয়া গেল।

টাকার আওয়াজও অবশ্য হইল না, অনশনজনিত মৃত্যুর বীভৎস রূপটি তার বাইকের সঙ্গ লইল। বালির রাস্তায় নিঃশব্দে চলিতেছিল বাইক—নিঃশব্দে বিকশিতদন্ত উলঙ্গ কঙ্কাল অনুসরণ করিতেছে হর-গোবিন্দের। সভয়ে সে পিছনে চাহিল। দু'পাশে আস-শ্যাওড়া ও বনকুলের ঝোপ। সেগুনের জঙ্গলও বাঁ পাশের বাগানে ঘন হইয়াছে। ডান ধারে নীল কুঠির ভগ্নাবশেষ ঢাকিয়া বুনো নীল চারার ফুল ফুটিয়াছে অজস্র। ঝোপে গা ঢাকিয়া ক্লান্তকণ্ঠ ঘুঘু ডাকিতেছে। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে ও ডাক সময়ে সময়ে মিঠা লাগে, আজ অত্যন্ত করুণ বোধ হইতেছে।

শহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও মনের বিমুখতা গেল না। সব কিছুতেই বিষাদের একটি সূক্ষ্ম পরদা প্রসারিত। স্বর্ণ-সৌধের জৌলুসে একদিক ভাবি আনন্দ ও গর্ব্ব-কল্পনায় বিস্ফারিত—অন্য দিকে গাঢ় ছায়া। বুনো পাড়ায় অশ্বত্থ গাছতলাটায় আজ প্রথমে নজরে পড়িল। স্বর্ণের দাহ আছে—দীপের দাহে সে উজ্জ্বল হয়, কিন্তু তলাকার খাদ? কতখানি খাদের ভারে কতটুকু সোনা চিক্ চিক্ করে!

না তৃপ্তি হইল পাতকুয়ার শীতল জল মাথায় ঢালিয়া—না আসিল আহারে রুচি।

কেন মরিল বুনো ছেলেটা? রোগেই ও মরিয়াছে। রোগ নহিলে মানুষ মরে? কিন্তু রোগের হেতু যদি অনাহার হয়—হরগোবিন্দর অনুশোচনাকে ঠেকাইবে কে! রোগই তো রোগের যথার্থ কারণ নয়।

বারকতক এপাশ ওপাশ করিয়া হরগোবিন্দ চক্ষু বুজিবার উপক্রম করিল।

পত্নী সুরবালা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ওমা, এখনও ঘুমোও নি!

—না, ঘুম না হ'লে জোর আছে? তিক্তস্বরে হরগোবিন্দ উত্তর দিল।

—ওমা, তা মারমুখো কেন? না হয় নাই ঘুমুলে।

—নাই ঘুমুলে! নিজেদের ত শিরদাঁড়া খাড়া করে দোকানের গদ্দিতে গিয়ে বসতে হয় না রাত বারোটা পর্য্যন্ত। খদ্দেরের সঙ্গে বক্ বক্ করতেও হয় না। দুপুরের একদফা ঘুম না হ'লে আর ক্ষতি কি!

সুরবালা ঈষৎ কাঁদিয়া কহিল, তা আমি কি বারণ করেছি তোমাকে ঘুমুতে?

—না, তুমি বারণ করবে কেন, বক্‌বক্ করছ তো মেলাই।

বাবাঃ—বাবাঃ—এই গেলাম। সুরবালা বাহির হইয়া যায় দেখিয়া

হরগোবিন্দ সজোরে পাশবালিশটা একদিকে আছড়াইয়া তড়াক্ করিয়া মাদুরের উপর উঠিয়া বসিল।

সুরবালা ফিরিয়া কহিল, উঠলে যে?

—নাঃ—ঘুমোব না আর। একটা পান দাও।

—না, গো—না, শুয়ে পড়। শেষকালে খোঁটা দিয়ে পোঁটা বার কর আর কি!

না—পান দাও।

পান চিবাইতে চিবাইতে মনে হইল, চিন্তা অনেকখানি তরল হইয়াছে। প্রসন্ন কণ্ঠে কহিল, একটু দোক্তা দেবে?

—হাঁ—তারপর মাথা ঘুরে পড় আর কি।

—একটুখানি। বেশ মুখ চোখ কান গরম হয়ে উঠবে, মাথাটা একটু ঘুরবে—

—তারপর দোকান কামাই করে আমার উপর তম্বি কর!

—তুমি বঝছো না দোক্তা না পেলে মদ খেতে হবে।

—বল কি, এতদুর অধঃপাতে গেছ?

হরগোবিন্দ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দোকানে মন্দ কাটিল না।

দক্ষিণপাড়ার দীনু কৈবর্ত্ত আসিল। আর্থিক অবস্থা সচ্ছল বলিয়া লোকটার চেহারা শাঁসে-জলে। অগ্নিমূল্যের অন্ন লইয়া যে আক্ষেপ করে—তার চেহারা অনেকটা রসিকতার মত। বলে, কি হে দত্তের পো, টাকা টাকা সের দাঁড়াবে চাল? হিসেবের বালাই নেই—তোফা ওজন

দাও—আর দাম বুঝে নাও। কি চেহারা কি হয়েছে বল দেখি। বলিয়া নেয়াপাতি গোছ ভুঁড়িটায় একটা টোকা মারে।

হরগোবিন্দ হাসিয়া উত্তর দেয়, আমাদের কি খুড়ো—চিনির বলদ বইত না। কিনছি—চড়া দামে। লোকে খেয়ে বাঁচে তাতে কি অসাধ আমাদের।

—তা ত বটেই। নিজেদের বাঁচাটাই বা কম কি হে? আচ্ছা ভায়া, গবর্ণমেণ্ট ত রেট বেঁধে দিচ্ছে জিনিষপত্তরের—অথচ ও দামে বাজারে মাল পাওয়া যায় না কেন?

হরগোবিন্দ চোখ টিপিয়া বলে, বোঝ ব্যাপার। বাঁধা দরে যদি জিনিষ পেতাম—এতদিন লাল হয়ে যেতাম।

—তা মন্দই বা হয়েছ কি। কালো চামড়া বলে ভেতরের লাল যতই বাড়ছে—ওপরে কালোর চেক্‌নাই মারছে। হেঃ—হেঃ—

ওধারে গোলযোগ হইতেই হরগোবিন্দ মনোযোগ দিলেন, কি রে তিনু—গোল কিসের?

আজ্ঞে—দেখুন না, এক পয়সার নুন নিয়ে আবার ফাউ চায়?

—ফাউ! চক্ষু বিস্তৃত করিয়া হরগোবিন্দ বলে, যুদ্ধের বাজারে ফাউ! ওহে মোড়ালের পো—ও ব্যবসা আমরা করিনে। অন্য দোকান দেখ।

অভিযুক্ত ব্যক্তি করুণ কণ্ঠে বলে, দেখুন না কর্ত্তা—এক পয়সার নুনে দু'বেলা চালানোই মুশকিল!

—কি হে—কি এত তরকারী রাঁধছ এই আক্রার বাজারে? হর-গোবিন্দ ধারালো কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

—আজ্ঞে তরকারি পাব কোথায়, নুন ভাতই ত সম্বল। তাই ত নুন একটু বেশিই লাগে।

তা হ'লে দু'পয়সার নাও। রায় দিয়া বিচারক যেমন প্রসন্ন দৃষ্টিতে এজলাসের দিকে চাহিয়া জন-মনোভাব পরীক্ষা করেন—তেমনই প্রসন্ন আস্তে হরগোবিন্দ ক্রেতৃমণ্ডলীর পানে চাহিয়া হাসিল।

ভবতারণ ভট্টাচার্য্যের হাতে মতিহারি দোক্তাপাতা ও কয়েক প্রকারের মশলার মোড়ক ছিল। তিনি হরগোবিন্দের হাসিতে মনে করিলেন—তাঁহার মতামতের প্রয়োজন এখানে সর্ব্বাধিক। একেবারে গদ্ গদ্ চিত্তে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন। তা যা বলেছ ভায়া, চাওয়াও দোষের—না চাইলেও নয়, অথচ—

হরগোবিন্দ কহিল, বসুন না দাদা, এই যে কাঠের বাকসোটায় চট পাতা আছে, তুমিও একটু বসো দীনুখুড়ো—পরামর্শ আছে।

ভবতারণ সাগ্রহে আসন গ্রহণ করিলেন, দীনু একটু নড়িয়া নিজের প্রয়োজনীয়তাকে প্রকট করিল।

হরগোবিন্দ বলিল, বলছিলাম কি জান খুড়ো, এই যে মাগ্যিগণ্ডা —এতে দেশের লোক বাঁচবে না, শেয়াল কুকুরের মত মরবে। দিন থাকতে এর প্রতীকার করা দরকার নয় কি।

সাগ্রহে মাথা নাড়িয়া ভবতারণ কহিলেন, এতো তোমার উপযুক্ত কথা। দেশের লোকের জন্য ক'জন ভাবে!

হরগোবিন্দ বলিল, যা অবস্থা দাঁড়াচ্ছে দিন দিন—তাতে আর উদাসীন থাকা উচিত নয়। আজ বুনো পাড়া দিয়ে আসছিলাম। দেখি না—অশ্বথ গাছতলায় একটা ছোঁড়া না খেতে পেয়ে—

—বল কি, না খেতে পেয়ে ভিক্ষে চাইছিল?

নিজকে সংবরণ করিয়া হরগোবিন্দ কহিল, ঠিক না খেতে পেয়ে নয় —অবশ্য রোগেই ছোঁড়াটা মরে গেছে।

—মারা গেল। অ্যাঁ!

ভবতারণের বিস্ময় দেখিয়া দীনু বলিল, মারা যাওয়াটা আর আশ্চর্য্যের কি দাদা, বরং বেঁচে থাকাটাই—

হরগোবিন্দ বলিল, যাই হোক, লোকে বলছে রোগ—না হয় ধরে নিলাম—অনাহার। বলি মারা তো গেল! একটু থামিয়া বলিল, বিদেশে যা হয় হোক—দেশের মাটিতে এসব কি কাণ্ড বল তো দাদা?

ভবতারণ বলিলেন, কলির চার পো পূর্ণ হ'য়ে এলো আর কি!

—যাই হোক, আমাদের কি উচিত নয় এর প্রতীকার করা।

দীনু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, আমরা তুচ্ছ প্রাণী—আমাদের কতটুকু সাধ্য যে—

ভবতারণ বলিলেন, এই দেখ না, ষষ্ঠীপুজোর দক্ষিণে পেলাম—তবে দোক্তাপাতা কিনতে পারলাম। একদিন হাই তুলে তুলে নেতিয়ে পড়েছিলাম ভাই।

হরগোবিন্দ বলিল, আপনারা যা পারেন দেবেন—সে আমি চাইছি না, কিন্তু নিজে তো কিছু লাভ করলাম। তাই ভাবছি, গরীব ভিখারীকে কিছু কিছু দেব। প্রত্যেক ভিখারীকে এক পালি করে খুদ কি এক পালি করে কলাই।

—ভাল—ভাল। ভবতারণ সাধুবাদ করিলেন।

—কিন্তু কি করে কাজ আরম্ভ করব তোমরা পরামর্শ দাও খুড়ো।

—পরামর্শ আর কি, একটা শুভদিন দেখে—

দীনু হাসিয়া বলিল, পাঁজি দেখবার দরকার নেই। কাজটা শুভ হ'লেও ব্যাপারটা বিবেচনা বিচারের ওপর দাঁড় করিও না। যত দেরি হবে—ততই মুশকিল।

—তা হ'লে—

—কালই আরম্ভ করে দাও। তবে একার সাধ্যে তোমার কতটুকু

হবে জানি না। অন্তত ব্যবসায়ী মহলকে যদি টানতে পার আর কণ্ট্রোলের চাল জোগাড় করতে পার তো বেশ কিছুদিন চলবে।

—বেশ তো, কণ্ট্রোলের চালের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে একখানা দরখাস্ত দিই—আর ব্যাপারীদের জানাই।

বড় ব্যাপারী কানাই সাধুখাঁ বলিল, তোমার মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়েছে গোবিন্দ। না খেতে পেয়ে লোক মরছে—সে দায়িত্ব তোমার?

কেন নয় বলুন? আমরা যদি কিছু কম লাভ করি—

—তা হ'লেও লোক মরবে। যারা কিনতে পারে তারা পঁচিশ আর পঁয়ত্রিশ টাকার তফাৎ খুব বেশি মনে করে না; বুনো বাগদাদের বাঁচাতে হ'লে যে রেটে চাল দিতে হবে তা যুদ্ধের বাজারে আকাশকুসুম।

—তবে কি বলতে চান লোক মরবে?

—উপায় কি! দ্বাপরে ভূভার হরণের জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়েছিলেন। মরাটাই হচ্ছে জগতের মুক্তি—এটা ভুলে যেয়ো না। ভাল কথা, যুদ্ধে এত লোক মরছে কেন? ওরা কি জানে না এ কি বিষম খেলা!

—যাই হোক—যুদ্ধে মরার সান্ত্বনা আছে, সে কৈফিয়ৎ রাষ্ট্র দেয়, আমার মৃত্যুর কৈফিয়ৎ যে আপনাকে দিতে হবে।

—কেন, তোমার কর্ম্মফল তা'হলে আমি বইব বল! ও কিছু না। বলি হিন্দুর ছেলে—গীতা মান ত? কে কাকে মারে! নিমিত্ত মাত্র। যে মরবার সে মরবে—যে থাকবার সে থাকবে, মাঝে হতে নিজের শান্তি নষ্ট করো না।

—আমি মনে করেছি—আপনারা সাহায্য না করেন—আমি নিজেই কিছু সাহায্য ওদের করব।

—বেশ ত—ভালই ত।

—একশ মণ খুদ, আর একশ মণ কলাই বিলুব।

—খুব ভাল। তবে কি না লাখ পুরতে যদি তিন কি সাড়ে তিন হাজার বাকি থাকে—আপসোস ঘুচবে না। পুকুরের জল হাজারটা কলসীতে ভরলে কমে যায়—নদীর জল কমে না—ভায়া।

—নাই বা করলাম লাভ।

—বেশ ত, অন্যে ফাঁপলে যেন হিংসে কর না।

—হিংসে করব কেন?

—মানুষের স্বভাব ত, তাই বললাম। তিনি হাসিলেন।

কথাটা খোঁচার মত—তথাপি হরগোবিন্দ রাগ করিল না। তর্কে হারিয়াও মনে যে আনন্দ হয়—সে অভিজ্ঞতা এই প্রথম লাভ করিল।

রাত্রির আহারটি তৃপ্তি সহকারেই হইল। প্রতীকার না হউক—প্রতীকার করিবার বলবতী ইচ্ছাতেই নিজেকে খানিকটা হাল্কা মনে হইল। যেন দশ মণের বোঝাটা কাঁধ হইতে নামিয়া গেছে।

বিছানায় শুইয়া হরগোবিন্দ ভাবিতে লাগিল, মাত্র দুশো মণ জিনিষ—তিন বড় জোর সাড়ে তিন হাজার টাকা। তাও লাভের অঙ্ক আধা-আধি, তাতেই আমার লক্ষ টাকা পুরবে না? পাগল! বড় ব্যবসাদার হলেই মন বড় হয় না। জানি ত সাধুখাঁকে!

নিজেকে আর একটু দৃঢ় করিয়া পাশবালিশটা চাপিয়া বাঁ পাশ ফিরিল। সকলের দায়িত্ব আমার নয়, কিন্তু নিজের পড়শীকে দেখাও ত কর্ত্তব্য। কাল আসতে আসতে বাজারে শুনলাম—জোলারা বলাবলি

করছে, না খেতে পেলে আমরা চুরি করব—ডাকাতি করব, না হয় খুন করব। কোম্পানী ফাঁসি দেয়—দেবে। এমনিতেও মরবো—অমনিতেও····। আচ্ছা, ধর—ওরা সত্যিই যদি চুরি ডাকাতি করে····

বাঁ পাশে বেদনা বোধ হইতেই বালিশ সমেত হরগোবিন্দ ডান ধারে কাত হইল।—না, রাজার আইন বড় কড়া। মুখে যে যাই বলুক—সাহস করবে না। তা'হলে বুনোরাই কি রেয়াৎ করতো আমাদের। যে ডাকাতের দল! হাঁ—কড়া আইন বটে। এমন শাসন করছে যে—মরবে জেনেও আঙ্গুলটি তুলিতে পারে না।

আপন মনে হাসিল। তারপর খানিকটা সুস্থির হইয়া চিৎ হইয়া শুইল।

—নাঃ, লাভ ত যথেষ্ট করলাম, কিছু দিলে আর ক্ষতি কি! যদিও আমি ওদের মুখের গ্রাস কাড়ছি নে—তবু অনেকে বলছে ত—যে পাপের ভাগী হচ্ছি। দিলামই বা কিছু। কালই বিলোবার ব্যবস্থা করব। যে ভিক্ষেয় আসবে তাকেই কিছু ক্ষুদ বা কলাই দেব। আচ্ছা, ওদের বলেই দিই।

হরগোবিন্দ ডাকিল, শুনছো?

সুরবালা মেঝেয় শুইয়া তালপাখা নাড়িতেছিল। ভাদ্রের গুমোটে শীঘ্র ঘুম আসে না। তা ছাড়া মুখের মধ্যে পান ও দোক্তা এখনও সম্পূর্ণ মজে নাই।

উত্তর দিল, কি বলছ?

সুরবালার কণ্ঠস্বরে হরগোবিন্দের চমক ভাঙ্গিল। তাই ত এত শীঘ্র বিচার-বিবেচনা না করিয়াই একশো মণ ক্ষুদ ও একশো মণ কলাই বিতরণের সঙ্কল্প ব্যক্ত করা উচিত কি? দানের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া—ধর যদি কোন কারণবশতঃ না দিতে পারা যায় ত অপযশের একশেষ।

তার চেয়ে আর একটু ভাল করিয়া হিসাব করিয়া শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করা ভাল। ক্ষুদ ও কলাই কিছু কালই গুদাম হইতে পলাইয়া যাইতেছে না। সাধুখাঁ মিথ্যা বলে নাই, পুকুরের জল কলসীতে ভরিলে কতক্ষণ থাকে! তার চেয়ে নদীর জল··· দ্বিতীয় লাখ পূরিতে কত অর্থের প্রয়োজন সেটা হিসাব করিতে ক্ষতি কি! দান করিতে কে নিষেধ করিতেছে, কিন্তু হিসাব না রাখাও মূর্খতা।

সুরবালা বলিল, কৈ—বললে না কিছু?

হরগোবিন্দ বলিল, না, একটু জল চাইছিলাম। তা থাক!

—থাক কেন, দিচ্ছি।

—না, না, থাক। আলো জেলে ঘুমটাকে মাটি করব না। সাগ্রহে সে নিষেধ করিল।

সুরবালা খানিক হত-বিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিল পরে আপন মনে বলিল কত খেলাই জান। তোমার আজ কি হয়েছে বল তো?

হাই তুলিয়া হরগোবিন্দ বলিল, আজ ঘুম আসছে—থাক কাল বলবো।

সত্য সত্যই হরগোবিন্দ ঘুমাইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে

পয়লা আগষ্ট কাটিয়া গিয়াছে, চেতাবনী-বিভীষিকাও সেই সঙ্গে কাটিয়াছে। প্রত্যহ পথ চলিবার সময় ভাবি, সত্যই কি বিভীষিকা কাটিয়াছে? শহরের পথে ভিড় বাড়াইয়াছে নূতন চাকুরিয়া নব যুবকের দল এবং অন্নবঞ্চিত পল্লীর দুর্গত জনসাধারণ। শেষোক্ত হতভাগ্যেরা কি বুঝিয়াছে জানি না—শহরের প্রশস্ত রাজপথে পঙ্গপালের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে এক মুঠা অন্নের আশায়। প্রকাণ্ড সৌধ, মটরসঙ্কুল পথ এবং সুবেশ চাকুরিয়াদের দেখিয়া হয়ত আশা করিয়াছে—পল্লীর ধানের ক্ষেত হইতে পলাতকা লক্ষ্মী—এই সৌধসমাকীর্ণ মহানগরে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধিয়াছেন। যুদ্ধের ছবি কাগজের পৃষ্ঠা আশ্রয় করিয়া কতটুকু বিভীষিকা আর দেখাইতে পারিতেছে, এই হতভাগ্য নরনারীরা মহা-নগরকে তার চেয়ে বেশি আতঙ্কগ্রস্থ করিয়া তুলিতেছে। আমরা কাগজে যখন উহাদের কথা পড়ি—সমবেদনায় 'আহা'র চেয়েও অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া পরস্পরের মন ভিজাইয়া দিবার প্রতিযোগিতা করি। পথে যখন উহাদের দেখি—সভয়ে খানিকটা ব্যবধান রাখিয়া চলি—পাছে উহাদের নোংরা কাপড় বা দেহের সংস্পর্শে আসিয়া কতকগুলি সাংঘাতিক রোগবীজাণু সংগ্রহ করিয়া ফেলি! যে জীবন পথের ধারে এ বেলায় ফোটা ফুলের মত ওবেলা ঝরিয়া পড়িতেছে—তাহাকে আবেগ-লেশহীন শাদা চোখে দেখিতেই অভ্যস্ত বলিয়া যে মৌখিক আক্ষেপ প্রকাশ করি তাহা আসলে উহাদের অকাল মৃত্যুর জন্য নহে—ব্যাধি সংক্রামতার আশঙ্কায়। অথচ হতভাগ্যদের জন্য আমাদের আন্তরিক টান যে নাই—এমন কথা বলাও দুষ্কর।

প্রত্যহ মহানগরের পথে চলিতে হয়। কর্ম্মব্যস্ততার জন্য দৃষ্টির চারিপাশের বস্তু যে ভাবে অবহেলিত হয়—সৌধ, যান-বাহন, জনস্রোত, পথের আবর্জ্জনা—ইহারাও সেই সঙ্গে আশ্চর্য্যভাবে মিশিয়া গিয়াছে। যখন অপ্রচুর বসনে কোন রকমে লজ্জা বাঁচাইবার অভিনয় না করিয়াই রুগ্ন নারী ক্ষুধাতুর ছেলে কোলে করিয়া হাত পাতিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়—অভ্যাসবশত বিনা বাক্যব্যয়ে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাই। সময় কোথায় যে করুণ আবেদনকে মনে স্থান দিব! কতটুকই বা সামর্থ্য যে উহাদের দুঃখ মোচন করিব!

পাঁচটা বাজে। আপিস হইতে বাহির হইলাম। আকাশে মেঘের সমারোহ। শ্রাবণের আকাশ জলভারে সর্ব্বদাই থম থম করিতেছে। ক্ষান্তবর্ষণের ফাঁকে যেটুকু পথ ট্রাম-বাসকে মাশুল না দিয়া অতিক্রম করা যায় তাহাই লাভ। কলিকাতার পথ—নিতান্ত বিজন মাঠের মত আশ্বাসহীন নহে। প্রশস্ত গাড়ি-বারান্দার উপকারিতা—এই সজল জলদজাল সমাচ্ছন্ন সতত-ক্রন্দনপরায়ণ আকাশের দেশে—বিশেষ করিয়াই বুঝিতেছি। সখ বা সৌন্দর্য্য মানুষকে মুগ্ধ করে এবং মানুষকে আশ্বাস দেয়।

খানিকটা পথ না চলিতেই বৃষ্টি নামিল। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নূতন প্রশস্ত রাস্তা, কোথাও আশ্রয় নাই। পা চালাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হইতে প্রচণ্ড বাতাস বহিয়া বৃষ্টির বেগ সহসা বাড়াইয়া দিল। সর্ব্বাঙ্গ বাঁচাইয়া পথ চলা দুষ্কর; সুতরাং কোন দেওয়ালের ধারে দাঁড়াইলে ধারাস্নান হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব ভাবিয়া প্রকাণ্ড এক সরকারী দপ্তরের বিফল প্রাচীরের (যেহেতু বোমার টুক্‌রাকে বিফল করিয়া মানুষকে বাঁচায়) পিঠে ছাতা মেলিয়া দাঁড়াইলাম। আমি একা নহি —আরো অনেকে আত্মরক্ষার্থ সেইভাবে আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু তাহারা

আমার মত সত্ত্ববিপন্ন আপিসের বাবু নহে। দৃষ্টির সীমানায় থাকিয়া যাহারা অ-দৃষ্ট সেই হতভাগ্যের দল।

মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। আর একটু প্রাচীর ঘেঁষিয়া তাহাদের স্পর্শ বাঁচাইয়া তাদের পানে চাহিলাম। গুটিচারেক নারী—রুগ্ন শিশু লইয়া প্রাচীরের পৃষ্ঠে দেহ রাখিয়া হাড় চর্ব্বণ করিতেছে। পরনে তাহাদের ময়লা ছেঁড়া কাপড়, কটি ছাড়াইয়া কিছুটা উর্দ্ধে উঠিয়াছে। ঘরের মধ্যে যে লজ্জা পোষণ করা সামাজিক শালীনতার অপরিহার্য্য অঙ্গ—পথের মাঝে তাকে টানিয়া আনা বিড়ম্বনা বলিয়াই হয়ত নিরাবরণ যুবতীদেহে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার সকরুণ চেষ্টা নাই, যুবতী-মুখে লজ্জা বাঁচাইবার সচকিত পাংশু ভাবও নাই। একটি ষাট বছরের বৃদ্ধা—তাহারই গোষ্ঠিভুক্তা আর তিনটি নারী ও দু'টি উলঙ্গ শিশু। কোলের ছেলেটার হাড় চুষিবার বয়স হয় নাই—মায়ের স্তনে মুখ দিয়া জীবনীরস সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে। আট-নয় বছরের ছেলেটি আর একখানি হাড় পাইবার প্রত্যাশায় মায়ের পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ও-পাশে একটি রুগ্না কুক্কুরীও প্রত্যাশাপূর্ণ ভাবে লাঙ্গুল আন্দোলন করিতেছে।

বৃষ্টির বেগ বর্দ্ধিত হইল, মানুষগুলি আর একটু দেওয়াল ঘেঁষিয়া বসিল, কুক্কুরী নড়িল না।

মোটা মোটা হাড়—মাংসের লেশমাত্র ছিল কিনা বলা দুষ্কর—অন্তত উত্তমরূপে লেহিত হইয়া কুক্কুরীর দিকে যখন নিক্ষিপ্ত হইল—তখন তাহার মসৃণ শ্বেতবর্ণ হইতে বিদ্রূপের রশ্মি বিচ্ছুরিত হইতে দেখিলাম। লাঙ্গুল আন্দোলন থামাইয়া কুক্কুরীটা হাড়খানা মুখের ভিতর পুরিল এবং পর মুহূর্ত্তেই মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিল। মানুষের সাধ্যায়ত্ত যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, সাধ্যেরও অতীত বলিয়া হাড়খানা অচর্ব্বিত

রহিয়াছে। কুকুরের দাঁতেও সেই শক্ত হাড় কণামাত্র চূর্ণিত হইল না। জলে ভিজিয়া অতি মসৃণ হাড় দুঃস্থ নারী ও দুর্ব্বল কুক্কুরীকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

বৃষ্টি আর একটু চাপিয়া আসিল। যে মেয়েটির কোলে শিশুটি স্তন্য পান করিতেছিল—বৃদ্ধা তাহাকে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় ধমক দিল। তাহার অর্থ, এই দারুণ বৃষ্টিতে ছেলেটিকে ভিজাইয়া অসুখে ফেলিবার দরকার কি!

বৃদ্ধার শাসনে মেয়েটি কোলের ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া অদূরস্থিত গাড়ি-বারান্দার উদ্দেশ্যে ছুটিল। আট-দশ বছরের ছেলেটি একটা ভাঙ্গা ঝুড়ি মাথায় দিয়া বৃষ্টিধারা হইতে বৃথা আত্মরক্ষার প্রয়াস করিতেছিল। দ্বিতীয় যুবতী তাহার হাত ধরিয়া সেই গাড়ি-বারান্দা অভিমুখে ছুটিল। তৃতীয় যুবতী কোথাও নড়িল না, আর একটু দেওয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা তখন কাঁপিতে কাঁপিতে আমার ছাতার অদূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার দিকে ছাতাটা আর একটু আগাইয়া দিলাম। আমার এক দিকের কাপড় ভিজিতে লাগিল। কি জানি কেন তাহাতে মনোযোগ না দিয়া উহার শতছিন্ন পরিধেয়খানি যাহাতে বৃষ্টিস্নাত না হয় সেই চেষ্টাই হয়তো করিলাম। দয়াপরবশ হইয়া নহে, এমনই অজ্ঞাতসারে ডান হাত-সমেত ছাতাটা ওদিকে হেলিল, একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম। বৃদ্ধার শরীর শীর্ণ, মাথায় চুল বিরল এবং শুভ্র। রোদে পুড়িয়া ও জলে ভিজিয়া কুঞ্চিত চামড়ার স্বাভাবিক বর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। পায়ের পাতা ফুলিয়াছে। তা ছাড়া সর্ব্বত্র অস্থিরাশি সুপ্রকট। শিথিল মাংসবন্ধনীতে সেগুলি সংযত থাকিতে চাহিতেছে না। চোখে ও মুখে জীবনীলক্ষণ—বালুগর্ভাশ্রিত নদীস্রোতের মতই অনুমানসাপেক্ষ। মরণের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ও বুঝি জীবনকে শেষ বারের মত ব্যঙ্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

প্রবল বৃষ্টিপাতে চারিদিকে সাদা দেখাইতেছে—রোগবীজাণুর আশঙ্কা আমার মনের কোথাও নাই। সে যেন ওই দিক্‌চিহ্নহীন বর্ষণের ঘন পর্দ্দায় ঢাকিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল—আলাপ করিবার।

—কোথায় বাড়ি তোমার?

—আমায় বলতেছ—বাবা?

—হাঁ, কোথায় বাড়ি?

—এই উলুবেড়েয় বাবা।

—কত দিন শহরে এসেছ?

—তা মাস দুই হবে। হবে নি? ও পাশের যুবতীকে প্রশ্ন করিল। যুবতী মুখ বাড়াইয়া ঘার কাত করিল।

—কি করতে দেশে?

—মজুরি। ধান ভানা, ধান সেদ্ধ, মুড়ি ভাজা, পেতে কুলো তৈরী—

—তা শহরে এলে কেন?

—কি করি বাবা—খেতে পাই নে। ধানের কল উঠে গেল—জিনিবপত্তর কেউ কেনে না।

—তোমরা একাই এসেছ, না—

—একা! বলে আধখানা গাঁ চলে এল। আর বাবা, কি খাব বলতো? হাঁ বাবা, ভগবান্ কি এমনি করেই মারবে!

—ভগবান্!

এত দুঃখেও ভগবানকে ভুলিতে পারে নাই। সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে অভিযোগ! কাহার বিরুদ্ধে?

—হাঁ বাবা, কত দিন এমনি ধারা চলবে?

উত্তর দেওয়া কঠিন। সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলাম না। পূর্ণ

সত্যের অভিমুখীন হইয়া অর্দ্ধ সত্যের প্রলেপ লাগাইয়া আত্মপ্রবোধ দিয়া লাভ কি।

—তা তোমরা জলে এমন ক'রে ভিজছো কেন? এই গাড়ি-বারান্দার তলায় গিয়ে থাক না কেন?

—থাক্‌তে দেয় না। লাঠি দিয়ে মারে, গায়ে জল ঢেলে দেয়।

—কে মারে?

—বাবুরা। বলে—দূর দূর।

সংক্রামক রোগবীজাণু—নোংরামি। এসব মনে হইলে করুণা মনের ত্রিসীমানা ত্যাগ করে।

—তা তোমরা ফুটপাথ নোংরা কর কেন?

প্রশ্ন করিয়াই ভাবিলাম, অসঙ্গত প্রশ্ন। পথের উপর মমতা কে কবে পোষণ করিয়াছে? আর উহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কাহারাই বা সুব্যবস্থা করিতেছে! বন্যার উৎপাতের মত উহারাও শহরবাসীকে জ্বালাইতে আসিয়াছে। বন্যা সাময়িক, উহাদেব দুঃখদাতা ভগবান্‌ই জানেন কতদিনে এই দুর্ভোগের অবসান ঘটিবে!

—তা শহরে খাও কি?

—এই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পাই।

—মাংস কোত্থেকে পেলে?

—উই বড় বাড়িটা থেকে ফেলে দেয়—কুড়িয়ে আনি।

—ভাত পাচ্ছ কোথায়?

—ভাত অনেক দিন খাই নি বাবা। এক মাস হ'ল, না রে?

উদ্দিষ্টা যুবতী মুখ বাহির করিয়া মাথা নাড়িল।

—তা শহরের বাবুরা অন্নছত্র খুলেছেন—সেখানে যাও না কেন। ভাত ডাল এক সঙ্গে সেদ্ধ ক'রে দেয়।

—কোথায়—কোথায় বাবা ?

বৃদ্ধার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। বারিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া যুবতী দেহের অর্দ্ধাংশ বাহির করিল।

—কোথায়—কোথায় গো ?

ঠিকানা বলিয়া দিলাম।

—তা বাবা আমাদের দেবে কেন ?

—তোমাদের জন্যই তো। রোজ এক এক জায়গায় দেড় হাজার ক'রে লোক খাচ্ছে।

—দেড় হাজার! কিন্তু আমরা কি খেতে পাব ?

অনাহারে—তাড়নায় কেমন অবিশ্বাস জন্মিয়াছে সব জিনিষের উপর।

—কেন, ঠিক সময়ে গেলে—

—না বাবা ভিড় ঠেলতে পারব নি। বুড়ো মানুষ—ক্ষ্যামতা নেই।

যুবতী বলিল, কত লোক সেখানে হত্যে দিচ্ছে গো, আমাদের বরাতে জুটবে নি। চোখের জ্যোতি তাহার নিভিয়া গেল, প্রাচীরের ওপিঠে দেহ ঢাকিবার চেষ্টা করিল।

বলিলাম, এমনিই ত বসে আছ—একবার চেষ্টা দেখ না কেন।

—আমরা যাব—আর কেউ যদি এখানে জায়গা নিয়ে নেয়।

—এই পথের জায়গা নিয়েও মারামারি ?

—হাঁ বাবু। জায়গাটা ভাল। অনেক বাবু আপিস যায়—কিছু ভিক্ষে পাওয়া যায়। ছাতু কি মুড়ি এক মুঠো এ জায়গা ছাড়লে তো পাব না।

মনটা অত্যন্ত কোমল হইয়া আসিয়াছে। কখন পকেটে হাত দিয়া দু-আনির অনুসন্ধান করিতেছি। প্রথমটা ভাবিলাম—দু-আনিই একটা দিব। আহা, চাল থাকিলে চালই দিতাম, কিংবা বাড়ি কাছে হইলে এক বেলা ওই কয়টি প্রাণীকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতাম।

দু-আনি হাতে ঠেকিল। পরক্ষণেই মনে হইল, মাসকাবারের মুখে এটিকে হস্তচ্যুত করিলে আমার দুর্গতি রোধ করিবে কে ? দয়া ভাল। সর্ব্বস্ব দানের দুঃখভোগের সহিষ্ণুতা না থাকিলে অনুশোচনাই সার হইবে। হিসাবী মন বলিল, যে দুঃখীর দল পঙ্গপালের মত কলিকাতা ছাইয়া ফেলিতেছে—তাহার প্রতিকার তোমার সাধ্যের বাহিরে। ধনী যদি তাহার শক্ত মুঠা শিথিল না করে—প্রজাপালনের গৌরব বহন করিবে কোন্ শক্তিমান্? দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা থাকা চাই তো।

হাতড়াইতে হাতড়াইতে একটা আনি ঠেকিল। কিন্তু ও তো আমার কাছে এখনও কিছু চাহে নাই। না চাহিতেই দিব কি ? হয়ত ভিক্ষান্নেই জীবন উহাদের ভাল ভাবেই চলিতেছে। দুই মাস এমনি করিয়া চালাইতেছে—আরও কত মাস হয়ত চালাইবে। অভ্যাসে সবই সহজ হইয়া আসিতেছে। জীবন বাঁচিলে তবে ত কুণ্ঠা—সম্ভ্রম !

বৃষ্টি ধরিয়া আসিল। ছাতা বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছি বৃদ্ধা সহসা আমার সামনে হাত পাতিয়া কহিল, ছাতু কিনে খাব একটা পয়সা দে বাবা।

স্বস্তি বোধ করিলাম। মাত্র একটি পয়সাতেই উহার অভাব মিটিবে !

একটি পয়সা দুর্ম্মূল্য। পকেট হাতড়াইয়া ক্ষুদ্রকায় চৌকা ডবল পয়সাটি বাহির করিয়া বুড়ির হাতে দিলাম।

বর্ষার রাজধানীতে সন্ধ্যা নামিতেছে। অন্নহীনের দল পথ আশ্রয় করিয়াছে। ভয়াল ভবিষ্যৎ এমন করিয়াই কি উলঙ্গ সত্যের হাত ধরিয়া প্রকাশিত হইতেছে ?

দীপশিখা ও তৈল

সংসারে চারিটি প্রাণী। চাকুরী এক দেশী মিলে—বিদেশী ম্যানেজারের অধীনে। সপ্তাহান্তে যে ক'টি টাকা হাতে আসে, তাহাতে সংসার একপ্রকার চলিয়া যায়। সুতরাং চিত্ত নিরুদ্বিগ্ন।

গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড মিল—নূতন একটা শহরের সৃষ্টি করিয়াছে।

মিলের সুতীব্র কর্কশ বাঁশী—গ্রামের বুকে প্রতি প্রত্যূষে দ্বিপ্রহরে ভূমিকম্পের সময় শঙ্খধ্বনির মত বাজিয়া উঠে। ভূমিলক্ষ্মী অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠেন। গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ জলস্রোতের মত অবাধে ইহার বিরাট জঠরে আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হয়।

প্রত্যূষে বাঁশীর ডাকে ঘর ছাড়িয়া তাহারা উধাও হইয়া যায়, দ্বিপ্রহরে শ্রান্ত শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসে। রাঁধা-খাওয়ার জন্য দুটি ঘণ্টা অবসর। তারপর আবার যাত্রা। অপরাহ্ণে যখন পুনরায় গৃহমুখী হয়,—মুখের ক্লান্তির উপর একটু হাসি বিকশিত হইয়া উঠিতে দেখা যায়। রাত্রির সুদীর্ঘ প্রহরগুলি তাহাদের একান্ত নিজস্ব।

রাত্রির প্রসন্ন হাস্য আবার দিনের আলোয় মলিন হইয়া আসে। দীর্ঘ দিনমান দুর্ভর সুদীর্ঘ প্রহরগুলি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিভীষিকা বিস্তার করে। তবু চিন্তাহীন শ্রমের সঙ্গে তাহাদের মিতালী অচ্ছেদ্য।

বিভূতিকে কলম চালনা করিয়া খাতায় অঙ্কপাত করিতে হয়। হাতের আঙুলগুলি বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিলেও নিবৃত্ত হইতে চাহে না। পশ্চাতের ক্ষুদ্র সংসার, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব প্রতিনিয়ত তাহাকে আলস্য হইতে রক্ষা করে। কর্ত্তব্যের বাঁধা ধরা ঘণ্টাগুলির উপরও দু-এক ঘণ্টা সে আলস্যকে জোর করিয়া শাসন করে।

বাড়ি আসিয়া একটা মাতুরের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া আকাশের তারা গোনে না, চাঁদের শোভাও দেখে না, শুধুই চক্ষু মুদিয়া আবাম উপভোগ করে। তাহার নিমীলিত নয়নের উপর শুভ্র কিরণলেখা শৈশবের মাতৃস্নেহের মত নিতান্ত অযাচিত ভাবেই শীতল স্পর্শ বুলাইতে থাকে।

দিন যায়। বিভূতির কুঞ্চিত কালো চুলের সযত্নরচিত তরঙ্গ বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে—তুই একটি শুভ্র বিন্দু এখানে-ওখানে ফুটিয়া উঠিয়া বয়সের বিজ্ঞতা ঘোষণা করিতেছে। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর এই যন্ত্র-দানবের জঠরে থাকিয়া সে আজ ভারতের আদর্শ কেরাণী।

মংলু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া দেখিল—হাজিরাবাবু গেট বন্ধ করিয়া দিতেছেন। কাতর চোখে মিনতি ভবিয়া সে কহিল, "বাবু মাপ কিজিয়ে। আজ নিয়ে সাতদিন লেট হোবে।"

বিভূতি খাতার উপর ঝুঁকিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কি দেখিতেছিল। মুখ তুলিয়া মংলুর পানে একবার চাহিল। পাণ্ডু অধরে এতটুকু ক্ষীণ হাসি, তুই কোটরগত চক্ষে আতঙ্ক ও অবসাদ-মিশ্রিত ম্লান দৃষ্টি, দুর্ব্বল পা দু'খানি অতিশীর্ণ দেহের ভারটুকুও বহিতে অক্ষম—থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। গেটের দুয়ার ধরিয়া কোনমতে সে পতনশীল দেহটাকে খাড়া করিয়া করুণা ভিক্ষা করিতেছে।

এমন প্রত্যহ কতশত আসে! মুখে উদ্বেগ, আশঙ্কা, চক্ষু ভিক্ষাভারে নম্র, কণ্ঠ আকুতিতে পরিপূর্ণ। যন্ত্রদানবের এ সকলে দৃক্‌পাত করিলে চলে না। ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিতে সে এখানে অবারিত করুণার ভাণ্ডার লইয়া বসে নাই।

ঐ মংলু যখন প্রথম আসে—সে বেশিদিনের কথা নহে—দেহে তার

ছিল অমিত ক্ষমতা, বক্ষে দুর্জ্জয় সাহস—দুটি পেশীস্ফীত বাহুতে অজস্র কর্ম্মক্ষমতা।

পূর্ব্বে যন্ত্রের অঙ্গসেবা করিবার জন্য দুজন লোক নিযুক্ত ছিল। মংলু আসিয়া সাহেবকে জানায়, কিছু বেশি টাকা মাহিনা পাইলে সে একাই অনায়াসে ঐ কর্ম্ম চালাইয়া দিতে পারিবে। বিদেশী ম্যানেজার মাহিনার উপর পাঁচটি টাকা বাড়াইয়া দিয়া মংলুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর কর্ম্মও সুশৃঙ্খলে চলিয়া যায়।

যন্ত্র দানবের অঙ্গসেবা করিতে করিতে মংলুর অমন যে লোহকঠিন দেহ তিলে তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। মাত্র পাঁচটি টাকার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমে জীবনের আয়ু:হবি কালের অনলে আহুতি দিয়া সে একদিন যন্ত্র-দানবের পায়ের তলায় অচৈতন্য হইয়া লুটাইয়া পড়ে।

সেই মংলু স্বাস্থ্য-সম্পদ হারাইয়া কোনো এক নিম্নতম বিভাগে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। তখন সপ্তাহে পাইত সওয়া আট, এখন পায় চার। যান্ত্রিকেরা মানুষের মর্য্যাদা ক্ষমতার অনুপাতেই দিয়া থাকেন। এ মাসে লেট হইয়াছে ছয় দিন, অর্থাৎ ষোল টাকা হইতে বারো আনা পয়সা জরিমানা-স্বরূপ বাদ যাইবে।

লেটের টাকাটা লাভের অঙ্কে জমা হয় না, জমা হয় আনন্দের খোরাকে। সাম্বৎসরিক বিরাট উৎসবে—বাইনাচ যাত্রা থিয়েটার ভোজখানায় দু-একটি অত্যুজ্জ্বল আনন্দময় রাত্রির পরমায়ু যোগাইতে এই ফণ্ডের উৎপত্তি। দুঃখের এমন বুকভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস আনন্দের তুফানে তর তর করিয়া ভাসিয়া যায়, মন্দ কি!

বিভূতি মংলুর পানে চাহিয়া একটু হাসিল এবং দ্বারবানকে গেট বন্ধ করিতে ইঙ্গিত করিল। মংলুর দু'আনা—বাৎসরিক আনন্দের পরমায়ুকে পরিপুষ্ট করিল।

পশ্চাতে আরও কয়েকজন পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে দুইজন লেট গেট দিয়া ঢুকিয়া বিভূতির পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "হরিকিষণ সিং, ইয়াকুব।"

বিভূতি তাহাদের পানে চাহিয়া কহিল, "দেখ হরিকিষণ, ইয়াকুব— তোমরা রোজই লেট কর। কোন দিন সায়েব জানতে পাবলে আমারই গর্দ্দানা নেবে। যে সব লোক হয়েছে আজকাল—লাগিয়ে দিতে কতক্ষণ!"

ইয়াকুব মুচকি হাসিয়া বলিল, "কি করি বাবু, হয়ে ওঠে না। আর গরীব মানুষ দু' টাকার বেশি—"

সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বিভূতি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আচ্ছা—আচ্ছা সে ঠিক ক'রে নেব। তবে মাসেব মধ্যে অন্তত দশটা দিন ঠিক সময়ে আস্‌বি, বুঝলি? নইলে যে দায়িত্বের কাজ!"

তাহারা চলিয়া গেল। মংলুর ষোল টাকার মধ্যে এ বন্দোবস্ত চলে না, অগত্যা সে ম্লানমুখে লেট লেখাইয়া আপনার জায়গায় গিয়া বসিল।

বিভূতির কার্য্যে সাহেব ম্যানেজার খুব সন্তুষ্ট। কুড়ি বৎসর ধরিয়া অসংখ্য দরিদ্র অনাথের দুঃখ-বেদনার ইতিহাস শুনিতে শুনিতে সে শুনিবার অনুভূতি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে। চোখ চাহিয়া দেখে ম্লান শীর্ণ রুক্ষ মুখগুলি, দৃষ্টির মধ্যে হৃদয়বৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে না। ফলস্বরূপ সে বিশ বৎসরে পঞ্চাশটি টাকা লাভ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এমন সৌভাগ্য নাকি আর কাহারও হয় নাই।

প্রত্যহ প্রত্যূষে এক কাপ গরম চা, খানিকটা হালুয়া, ফুলকা দুখানা

লুচি ও একটু তরকারি খাইয়া সে আপিসে আসে। কলের বাঁশী বাজিতে তখনও কয়েক মিনিট বাকী থাকে। দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া তোলা জলে স্নান ও চর্ব্বচোষ্য আহারান্তে নিদ্রা। গ্রীষ্মকাল হইলে স্ত্রীকে শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতে হয় এবং অন্যকালে ব্যজন অভাবে পদসেবা। অপরাহ্নে আবার একদফা পরিচর্য্যার পালা। মিছরির সরবৎ বা ডাবের জল। বাহিরের রোয়াকে মাদুর বিছাইয়া গড়গড়ায় কলিকা চাপাইয়া নলটি মুখে তুলিয়া দেওয়া ও পানের ডিবাটা শিয়রের কাছে আধখোলা ভাবে রাখিয়া—পারিলে একটু বাতাস করা—নিত্য কর্ত্তব্য-কর্ম্মের মধ্যে। স্ত্রী সে পরিচর্য্যাটুকু করে।

একটি পুত্র ও একটি কন্যা; কিন্তু তাহাদের দুধের খরচ জামাকাপড়ের ফর্দ্দ ও আবদারের বহরও সামান্য নহে। এজন্য ঋণীস্ত্রীকে সদাই তটস্থ হইয়া এ সকলের উৎসমূলে নিয়ত সলিল সেচন করিতে হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এই পরিচর্য্যার সমারোহ চলে। তারপর বিশ্রাম। কিন্তু কয় ঘণ্টার জন্যই বা! অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পাঠ-ঝাঁট সারিয়া পুনরায় তাহাকে স্বামী-দেবতার ভোগের আয়োজন সুসম্পন্ন করিতে হয়।

ক্ষুদ্র সংসারটি এইরূপে নিরুদ্বিগ্নে চলিয়া যায়।

সেদিন দ্বিপ্রহরে ম্যানেজার ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বোস, ক'দিন থেকে একটা কথা শুনছি। অনেকগুলি লোক নাকি রোজ লেট হয়?"

বিভূতি লম্বা সেলাম জানাইয়া বলিল, "হ্যাঁ স্যার, তাদের নাম তো লেট বইয়ে উঠিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিই।"

ম্যানেজার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তা ছাড়া আরও অনেক আছে যাদের নাম লেট বইয়ে ওঠে না।"

বিভূতির মুখ নিমেষে পাংশু হইয়া গেল; কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে সে তাহা সামলাইয়া লইয়া ঈষৎ হাস্যমুখে বলিল, "ও সব মিছে কথা স্যার। যারা লেট হয়, তারা হিংসে ক'রে আপনাকে লাগিয়ে গেছে।"

ম্যানেজার বলিলেন, "আচ্ছা যাও, ওসব কথা আর যেন না শুনি।" বিভূতি গমনোদ্যত হইলে তিনি পুনরায় বলিলেন,—"ভাল বোস, সে কাজের কি হ'ল?"

ইঙ্গিতটা বিভূতি বুঝিল। একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "দশ টাকা কব্‌লে ছিলাম স্যার,—রাজী হয় কই! পাজী—ছোটলোক।"

ম্যানেজার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন "ননসেন্স্‌! একটা কুলি-কামিনা, আচ্ছা—আচ্ছা—যাও। হাঁ, দেখ বোস, তোমার পারসন্যাল ফাইলে একটা গুড রিমার্ক দিয়েছি। কাজটা হাওয়া চাই।"

লম্বা সেলাম জানাইয়া বিভূতি বলিল, "আচ্ছা।" নিজের জায়গায় বসিয়া সে মহা আস্ফালন আরম্ভ কবিল। যত সব ছোটলোক বেইমান! পিপীলিকার পাখা উঠিয়াছে, দাঁড়াও, এই তেজ ভাঙিতে কতক্ষণ।

ইয়াসিন তাহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, ক্রোধটা গিয়া পড়িল তাহার উপর। উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া বলিল, "ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস যে?"

ইয়াসিন বাবুর রক্ত চক্ষু দেখিয়া বিনীতভাবে বলিল, "হুজুর, ভৈরবের জরু কাজ করতে করতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ভারি দুর্ব্বল সে, তাই ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।"

মুখ খিঁচাইয়া বিভূতি বলিল, "ডাক্তার! ডাক্তার এসে কি করবে? এ সব ভিট্‌কেলমি—সখের মূর্চ্ছো!"

—"না বাবু, আধ ঘণ্টা হ'য়ে গেল—"

"—ফের জবাব! যা নিজের চরকায় তেল দিগে যা। মূর্চ্ছা না ভাঙে—দিচ্ছি কুলি ডাকিয়ে গেটের বাইরে পাঠিয়ে।"

ইয়াসিন ফিরিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে আর একজন কুলি আসিয়া সংবাদ দিল—স্ত্রীলোকটির এখনও চৈতন্যসঞ্চার হয় নাই।

বিভূতি আদেশ দিল, উহাকে ধরাধরি করিয়া মিলের বাহির করিয়া দেওয়া হউক এবং সেখান হইতে অবস্থা বুঝিয়া মিল হসপিটালে পাঠাইতে পারে।

কয়েক ঘণ্টা পরে সংবাদ আসিল—স্ত্রীলোকটির চৈতন্য আর ফিরিয়া আসে নাই।

কয়েক মাস হইতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। দুর্ব্বল হৃদয়যন্ত্র সহসা অচল হইয়া গিয়াছে।

তখন ছুটির ঘণ্টা বাজিতেছে। দলে দলে কারামুক্ত বন্দী উৎফুল্ল মুখে বাহিরে আসিতেছে। সংবাদটা শুনিয়া কেহ 'আহা' বলিল, কেহ নীরবে গেট পার হইয়া চলিয়া গেল, কেহ কেহ বা সঙ্গীর সঙ্গে পূর্ব্ববৎ হাসি-গল্প করিতে করিতে পথের প্রান্তে মিলাইল।

বিভূতি ঝরিয়া সর্দ্দারকে ডাকিয়া বলিল, "যাক্‌, ভালই হ'ল। মেয়েটা না পারত খাটতে, না ছিল দেখতে শুনতে ভাল। দেখ সর্দ্দার, এবার শক্ত দেখে একটা লোক নিও।"

শিরসঞ্চালন করিয়া হাসিমুখে সর্দ্দার বলিল, "হাঁ, বাবু। আমারই ঘরে আছে—কাল নিয়ে আসব। দুটো লোকের কাজ সে একা ক'রবে।"

বিভূতি বাড়ি আসিয়া দেখিল—প্রতিদিনের মত রোয়াকে জল ঢালিয়া মাদুর পাতিয়া দেওয়া হয় নাই। জামা জুতা ছাড়িয়া সে রুক্ষ-কণ্ঠে হাঁকিল, "কি লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ড সব! এখনও—"

স্ত্রী ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "লখিয়ার সঙ্গে একটু কথা কইতে দেরি হয়ে গেল।"

বিভূতি অপ্রসন্নমুখে বলিল, "কে সাত পুরুষের কুটুম লখিয়া যে তার সঙ্গে কথা না কইলে চলছিল না! ও সব ছোটলোক মাগীদের কেন ঢুকতে দাও বাড়িতে?"

স্ত্রী চাপা গলায় বলিল, 'আহা দুঃখী—দুঃখু জানাতে আসে। ওর স্বামী মংলুর নাকি ক'দিন লেট হয়েছে—টাকা কেটে নেবে! তাই বল্‌তে এসেছিল। রোগা ছেলেটার বার্লির পয়সা—"

বারুদের স্তূপে আগুন পড়িল। বিভূতি গর্জ্জন করিয়া কহিল, "ওঃ ভারি আমার দরদ রে! যাক্ না সায়েবের কাছে,—এখানে কেন? যে নিয়ম করেছে—বলুক্ না তাকে গিয়ে! যত সব—", বলিয়া একটা অকথ্য গালি উচ্চারণ করিয়া গা ধুইতে লাগিল।

স্ত্রী জল ঢালিয়া রোয়াক মুছিয়া মাদুর বিছাইয়া দিল ও কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। লখিয়া ততক্ষণ চলিয়া গিয়াছে।

সে রাত্রিতে স্বামী-স্ত্রীতে মান-অভিমানের খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল। রাত্রির আহার-পর্ব্ব মিটিয়া গেলে স্ত্রী বারান্দায় মাদুর বিছাইতেই বিভূতি কক্ষমধ্য হইতে ডাকিয়া বলিল, "ওখানে কেন?"

অভিমানিনী কোনো উত্তর না দিয়া শুইয়া পড়িল।

বিভূতি খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া এক সময় বারান্দায় উঠিয়া আসিয়া কোমলকণ্ঠে কহিল, "এটা কি ভাল হচ্ছে! কি এমন বলেছি যে রাগ হ'ল!"

তথাপি উত্তর নাই।

একটু রুষ্ট হইয়া উচ্চকণ্ঠে সে কহিল, "ভাল জ্বালাতনেই পড়লুম যাহোক! বলি, হঁ্যা—না, যা হয় একটা বল, সারাদিন খেটেখুটে রাত্রিতে এ সব সহ্য হয় না।"

এবার স্ত্রী উত্তর দিল, "আমাদের আর রাগ দুঃখু কি বল! বাঁদীর মত এসেছি—গতর জল ক'রে খাটছি। যেদিন দেহ আর বইবে না, দিও বিদেয় ক'রে অনাথ আশ্রম-টাশ্রমে।"

বিভূতি অল্প হাসিয়া বলিল, "পাগল দেখ! বলি কি এমন বললুম?"

স্ত্রী উত্তর দিল, "কিছু না, যাও শোও গে। খুব ভোরে আবার উঠতে হবে। একটু না ঘুমুলে দেহ বইবে না যে।"

বিভূতি একটু অপ্রতিভ হইয়া কোমল কণ্ঠে কহিল, "বুঝি সবই, কিন্তু দেখছ ত মাইনের বহর। হাতে মাখতে কুলোয় না, একটা যে ঝি রাখব—"

অবশ্য উপরির টাকাটা স্ত্রীর হাতে না দিয়া বরাবর সে পোষ্টাপিসে জমা দিয়া আসিত। এ বিষয়ে স্ত্রী বিন্দুবিসর্গ জানিত না।

স্বামীর কোমলস্বরে স্ত্রীর অভিমান টুটিয়া গেল। ধীরে ধীরে সে উঠিয়া আসিয়া কহিল, "চল, তোমায় একটু বাতাস করি। সারা রাত্তির না ঘুমুলে বড় কষ্ট হবে।"

আপিসে সেদিন গান্ধী-আন্দোলনের আলোচনা চলিতেছিল। বক্তা ছিল বিভূতি, তাহার সহকারী ও অন্য বিভাগের একজন পক্ককেশ বাবু।

সেই বাবুটি, নাম হরিশবাবু, কহিলেন, "আর ত পারা যায় না, বিভূতিবাবু। রোজ রোজ হৈ-চৈ, দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে দিলে।"

বিভূতির সহকারীর নাম কমল। বয়স অল্প।

সে কহিল, "কেন হরিশ-দা, কি হ'ল?"

হরিশবাবু মুখে একটা হতাশব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া কহিলেন, "আর মশাই, স্বদেশী স্বদেশী ক'রে দেশটা যে উচ্ছন্নে দিলে! আজ অমুক, কাল তমুক—কাঁহাতক হাঙ্গাম-হুজ্জ্‌ত সামলানো যায়? সিগারেট কোম্পানী তো শুনছি অনেককে একমাসের নোটিস দিয়েছে। যদি এক মাসের মধ্যে বিক্রী না বাড়ে ত এতগুলি লোকের চাকরী খতম। আমার সম্বন্ধী ত কেঁদে এসে বললে, জামাইবাবু, কি হবে?"

ইঁহার মর্ম্মব্যথাটুকু বুঝিতে পারিয়া কমল রহস্য করিয়া কহিল, "কেন ভগ্নীপতির মিল রয়েছে, ভাবনা কি!"

এ কথায় রুষ্ট হওয়া উচিত। হরিশবাবু কিন্তু হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের রক্ত গরম, চাকরির থোড়াই কেয়ার কর।"

কমল বলিল, "তিনিও শুনেছি অবিবাহিত। বয়স পঁচিশ, তবে ভাবনা কি?"

হরিশবাবু বলিলেন, "নাঃ, তার আর ভাবনা কি, চাপবেন ত আমারই স্কন্ধদেশে!" বলিয়া দারুণ দুঃখে তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কমল হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "আপনি কি বলেন বিভূতিবাবু, দাদার অবস্থা সসেমিরে ক'রে তুলেছে।"

বিভূতি গম্ভীরভাবে কহিল, "সত্যি, এ অন্যায়। যা হবে না তা নিয়ে কেন মাথা কোটাকুটি! আমাদের অল্প বিদ্যে, এর চেয়ে কোথায়

কে বেশি মাইনে দিয়ে রাখবে? ওরা জাত ভাল, ছুটো মিষ্টি কথায় অনেক কাজ আদায় করা যায়।"

কমল বলিল, "চাকরিই যে আমাদের চিরকাল করতে হবে তার মানে কি?"

বিভূতি বলিল, "না হ'লে সংসার চলবে কি ক'রে? এক কাঠা জমি নেই যে চাষ করব। আর চাষ করবার শক্তি কোথায়?"

হরিশবাবু মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "যা বলেছেন বিভূতিবাবু, লাখো কথার এক কথা।" কমলের পানে ফিরিয়া বলিলেন, "ওরে ভাই সবই জানি। একদিন ঘরে চাল না থাকলে কেউ ডেকে খবর নেয় না। কেন মিছে হ্যাঙ্গামা! স্বরাজ এলে আমাদের কি বল, ঘুচবে অন্নবস্ত্রের সমস্যা?" বলিয়া আপন মনে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কমলের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে নম্র দৃঢ় স্বরে কহিল, "এত বড় একটা আন্দোলনকে অমন হাল্কাভাবে উড়িয়ে দেবেন না আপনারা। কেরাণীরা সব চেয়ে হতভাগ্য তা মহাত্মাজী জানেন। জানেন বলেই তাদের বাদ দিয়ে রেখেছেন।"

সহসা বিভূতির মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। রুক্ষকণ্ঠে সে কহিল, "আপনি খদ্দর প'রে আসেন ব'লে কাল ম্যানেজার সাহেব বলছিলেন, 'ওসব স্বদেশীয়ানা বারণ ক'রে দিও বোস।' কথাটা ভাল নয়, তাই সাবধান ক'রে দিলাম।" বলিয়া সেখানে আর ক্ষণমাত্র না দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

কমল হরিশের পানে চাহিয়া কহিল, "এ অপরাধের শাস্তি কি হরিশ-দা?"

হরিশবাবু আপন স্বভাবসিদ্ধ নম্রকণ্ঠে কহিলেন, "আমরা ত বুড়ো

হ'য়ে মরতে চলেছি, আমাদের কি, এইবেলা একটু হুঁস ক'রে চ'লো ভাই। সাবধান হয়ে না চলতে পারলে দু'কূল যাবে।"

কমল ম্লান মুখে কহিল, "কূল আর কোথায়, দাদা, যে যাবে! আমাদের তো ঃ

"নাহি তল—নাহি তীর
মৃত্যুসম স্থির নীর—সদা বিরাজে।"

হরিশবাবু বলিলেন, "যা ভাল বোঝ, কর। কবিত্বে পেট ভরে না ভায়া, বুঝেছ ?"

কমল হাসিয়া বলিল, "এ পেট ছাইপাঁশেও ভরে দাদা, চিরকাল ভ'রে এসেছে।"

ঝড় উঠিলে নদীর বক্ষ উদ্দাম হইয়া উঠে। তার দোলায় ছোট-বড় সকল তরণীই দুলিতে থাকে। মিলের মধ্যেও একটা সুস্পষ্ট ঝড়ের পূর্ব্বাভাস ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। সদা-বিনীত জোড়হস্ত মানুষগুলির মাথা যেন কিসের সাহসে সোজা হইয়া গেল, কুণ্ঠিত পদধ্বনি সহজ হইয়া আসিল। উত্তরের প্রত্যুত্তর তাহারা বেশ সোজাভাবেই দিতে লাগিল।

বিভূতি কঠোর নীতি অবলম্বন করিল। ইহাতে আপাত সুফল লাভ হইলেও ভবিষ্যৎ ভরসাময় বলিয়া বোধ হইল না। কালবৈশাখীর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বজ্র-বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝা-ভরা ধূসর স্তব্ধ মেঘের অন্তরখানি কি যেন কিসের প্রতীক্ষায় মুহূর্মুহু শিহরিতে লাগিল।

কমল বিভূতিকে বলিল, "হাওয়ার গতি ফিরে গেছে বিভূতিবাবু, একটু সাবধান হয়ে কাজকর্ম্ম ক'রবেন।"

বিভূতি ত রাগিয়াই আগুন। অসহিষ্ণু, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "তোমায় অত ফোপরদালালি করতে হবেনা। কালকের ছেলে, উপদেশ দিতে এসেছ আমায়!"

তাহার রাগ দেখিয়া কমল চলিয়া যাইতেছিল। বিভূতি তাহাকে ডাকিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল, "দেখ, সেদিন বারণ ক'রে দিয়েছি খদ্দর প'রে মিলে এসো না, তা তুমি শোন নি। জান—এর কি ফল হ'চ্ছে?"

কমল বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "কি?"

বিভূতি অগ্নিময় দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া কহিল, "কুলিরা যে মুখের উপর চোটপাট করে, কিসের জোরে? ঐ খদ্দরের জোরে। দেখনি কত কুলি ওই মোটা ক্যাঁটকেঁটে জামা গায়ে দিয়ে বুক ফুলিয়ে সামনে দিয়ে চলে যায়! যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ। ছোটলোক সব মনে করে—"

বিরক্ত হইয়া কমল কহিল, "কিন্তু দোষ কি ওরা ছোটলোক ব'লেই? চিরকাল মাথা নীচু ক'রে চলেছে ব'লে হেঁট হয়েই থাকতে হবে! এই আলো-বাতাসকে আমরা যেমন উপভোগ করি—ওরাই বা তা না ক'রবে কেন? কেন ওরা আমাদের পলকা জাত বাঁচিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে দিয়ে চলবে?"

ধৈর্য্যচ্যুত বিভূতি চীৎকার করিয়া ডাকিল, "কমল!"

কমল বিস্ময়বিমূঢ়ের মত তাহার অগ্নিজ্বালাময় মুখের পানে চাহিল।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বিভূতি বলিল, "আমি বলছি, কাল থেকে যদি খদ্দর ছেড়ে না এস, আর ঐ সব লম্বা বুলি আওড়াও ত ফল ভাল হবে না। শেষকালে দুঃখ ক'রো না যে বিভূতিবাবুর এই কাজ!"

কমল একটু ম্লান হাসিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, 'দাসত্বের এই পলকা সুতোয় বেঁধে যখন-তখন চোখ রাঙাবেন না, বিভূতিবাবু। আপনাদের

হয়ত মায়া বেশি হয়ে গেছে, মোটা মাইনে। আমাদের পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি—"

মুখ বিকৃতি করিয়া বিভূতি বলিল, "কেয়ার করনা? তা এতই যদি ডোণ্টো কেয়ার কর, তবে চাকরির আগে দু'বেলা এসে পায়ে তেল মালিশ করতে কেন?"

হাসিয়া কমল কহিল, "হয়ত দিল্লীকা লাড্ডুর দশা হয়েছিল, তাই। দেখছি, ও জিনিষের দু'পিঠই সমান"।

বিভূতি কথাগুলি ঠিক বুঝিতে পারিল না। তেমনই রুষ্টস্বরে কহিল, "যাও কাজ করগে। কিন্তু সাবধান।"

কমল হাসিয়া ললাটে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া উদ্ধপানে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন কমলের খদ্দরের পাঞ্জাবীর পানে চাহিয়া বিভূতির মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। কোনো বাক্যব্যয় না করিয়া সে সাহেবের ঘরে চলিয়া গেল।

তিনটার সময় কমল ফিরিয়া দেখিল টেবিলের উপর একখানি সাদা চিরকুটে সাহেব কি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। পড়িয়া বুঝিল—গোলামীর স্বর্ণ জিঞ্জীর খসিয়া পড়িয়াছে।

চিরকুটখানি বিভূতির টেবিলের উপর রাখিয়া বেশ হাসিমুখে কমল বলিল, "ধন্যবাদ।" তারপর ধীরে ধীরে গেটের বাহির হইয়া গেল।

বিভূতি যেমন একমনে কাজ করিতেছিল, তেমনই নিবিষ্ট চিত্তে কলম চালনা করিতে লাগিল।

কথাটা রাষ্ট্র হইতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না।

হরিশবাবু আসিয়া হাসিমুখে বিভূতিকে বলিলেন, "শুনলুম সব। মতিচ্ছন্ন ছোঁড়াটার! যাক, হরি হে—তোমারই ইচ্ছা।"

বলিয়া একটি হাই তুলিয়া ডান হাতে কয়েকটা তুড়ি দিয়া বিভূতির পানে চাহিয়া কিছু শুনিবার প্রত্যাশা করিলেন হয়ত।

বিভূতি মুখ তুলিল না, কথাও কহিল না। নির্ব্বিকারচিত্তে খাতায় অঙ্কপাত করিতে লাগিল।

হরিশবাবু পুনরায় একটা হাই তোলার সঙ্গে কয়েকটা তুড়ি দিয়া আরম্ভ করিলেন, "তাহ'লে ওর জায়গায় লোক একজন চাই ত। তা সেদিন ব'লছিলুম না ব্যাটারা স্বদেশী ক'রে সব গোল্লায় দিলে। আহা! অমন ভাল আপিস এক কথায় উঠে গেল! কত লোকের যে অন্ন গেল। দেবে কি ব্যাটারা কোনো সন্ধান নিয়ে তাদের মুখে এক মুঠো তুলে? সব স্বদেশী ক'রছেন, গুষ্টির পিণ্ডি ক'রছেন।"

বিভূতির এই দীর্ঘ মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা ভাল লাগিতেছিল না। একটু নীরস কণ্ঠে সে কহিল, "যান, আপনার জায়গায় গিয়ে বসুন। এখুনি সায়েব আসবেন।"

—"সায়েব।" বলিয়া ভীত ত্রস্ত নয়ন নিমেষে চারিদিকে বুলাইয়া লইয়া তিনি দ্রুত কণ্ঠে বলিলেন, "তবে চল্লুম।"

খানিক অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন ও খপ্ করিয়া বিভূতির কলমসুদ্ধ হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া মিনতি ভরা কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু আমার কথাটা মনে রাখিস দাদা, অনাথ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ।"

বিভূতি মুখ তুলিতেই তিনি তেমনই করুণা-বিগলিত দ্রুত কণ্ঠে বলিলেন, "ছোঁড়াটার চাকরি গেছে—আমার সম্বন্ধীর। তার কথাটা—", বলিয়া অৰ্দ্ধ সমাপ্ত কথাটা শেষ না করিয়াই একরূপ ছুটিতে ছুটিতে আপন জায়গায় আসিয়া বসিলেন।

হৃদয়ের মধ্যে দুটি রাজ্য। দুটির শাসনই সারাক্ষণ অন্তরের মধ্যে চলিতে থাকে। নিম্নের রাজ্যে আজ ঊর্দ্ধের একটি কিরণরেখা তির্য্যক্‌গতিতে আসিয়া খানিকটা অন্ধকারকে অনাবৃত করিয়া দিয়াছে। সেই আলোকোদ্ভাসিত নগ্ন অন্ধকারের পানে চাহিয়া বিভূতি বারম্বার কিসের লজ্জায় কুণ্ঠায় অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সেদিন অপরাহ্ণে বাড়ি আসিয়া সে স্ত্রীকে অকারণে তীব্র ভর্ৎসনা করিল, মেয়েটিকে গালি দিল, ছেলেটিকে একটা চড় মারিয়া হুলস্থূল বাধাইয়া তুলিল।

বারান্দায় মাদুরের উপর শুইয়া আজ সে চক্ষু মেলিয়া অন্ধকার নিশীথের শোভা দেখিতে লাগিল।

—"বাবুজী বাড়ি আছেন ?"

—"কে, হীরা সিং ? আচ্ছা, এদিকে এসো।"

হীরা সিং বাড়ির মধ্যে আসিয়া পৈঁঠার উপর উপবেশন করিল।

বিভূতি পাশ-বালিশটার উপর ভর দিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে তাহার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "খবর কি সর্দ্দার ?"

হীরা সিং হতাশাভরে অনেক কথাই বলিল। তাহার মোটামুটি অর্থ এই—মিলের সকল কুলিই ভিতরে ভিতরে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। শীঘ্র একটা ধর্ম্মঘট হইলেও হইতে পারে। এখন হইতে খুব সাবধানে কাজ করিতে না পারিলে অচিরে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। চাই কি, মিল বন্ধ হইয়াও যাইতে পারে।

বিভূতি সমস্ত শুনিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নিঃশব্দে কি ভাবিল। পরে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল, "তোমার দেশ কোথায় সর্দ্দার ?"

—"বিলাসপুর।"

—"সেখানে অনেক কুলি পাওয়া যায়, না ?"

—"যায়। কিন্তু বাবু, তাদের আনতে গেলে অনেক সময় যাবে। তার পর, মারের ভয় আছে।"

বিভূতি হাসিয়া বলিল, "ইংরেজ-রাজত্বে মারে কোন্ শালা—সে ভয় নেই। শোন, কালই তুমি দেশে চলে যাও, সেখানে গিয়ে যত পার লোক যোগাড় কর। এখানে যেদিন দেখব ব্যাটারা কাজে আসছে না, সেই দিন তোমায় টেলিগ্রাম করব। তুমিও গুছিয়ে নিয়ে চলে আসবে।"

তথাপি হীরা সিং ইতস্তত করিতে লাগিল।

বিভূতি তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলিল, "ভয় কি ? আমরা পুলিশ খাড়া করে চারিদিক পাহারা দেওয়াব। তুমি বিনা ভয়ে চলে আসবে।" বলিয়া ঘরের মধ্য হইতে জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

—"তোমার আলো আছে ত ? চল, এক বার সায়েবের বাংলোয় ঘুরে আসি গে। একটা পাকা পরামর্শ হওয়া ভাল।"

যাইতে যাইতে হীরা সিং বলিল, "কিন্তু বাবু, এমন ক'রে কতদিন চলবে ?"

বিভূতি অন্ধকারের মধ্যে সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামিলে বিভূতি বলিল, "কি জান সর্দ্দার, যে আলো একবার জ্বলেছে—আর কি তা নেবে ? পিদীমের শিখা যতক্ষণ জ্বলবে—তেল সলতেও ততক্ষণ যোগাতে হবে। কত যাবে, কত আসবে, পিদীম অমনিই জ্বলবে।"

শিখা জ্বালিবার ব্যবস্থা করিয়া বিভূতি অনেক রাত্রিতে বাড়ি ফিরিল। নিজের কর্ম্ম-ক্ষমতায় আত্মপ্রসাদে চিত্ত উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল—দিনের গ্লানির আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট ছিলনা।

ঊর্দ্ধজগতের রশ্মিরেখা নিম্নজগতের নিদারুণ প্রহারে মূর্চ্ছাহত হইয়া মিলাইয়া গেল।

সামান্য ইন্ধন পাইয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। জলযোগান্তে একটা সিগারেট ধরাইয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে বিভূতি মিলের গেটে যেমন আসিয়াছে, অমনি পশ্চাত হইতে কে একজন তাহার মুখের সিগারেটটি টপ করিয়া তুলিয়া লইল ও হাতে বিড়ি গুঁজিয়া দিয়া বিনীত সেলাম করিয়া মাপ চাহিল।

অসহ্য ক্রোধে তাহার পানে চাহিয়া বিভূতি চীৎকার করিয়া উঠিল, "হারামজাদা শূয়ার কী—"

তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "বাস্ কর।"

বিভূতি পাগলের মত হইয়া গেটের মধ্যে ঢুকিয়া দারোয়ানকে আদেশ দিল, উহার কান ধরিয়া জুতা মারিতে মারিতে মিলের সীমানা হইতে দূর করিয়া দাও।

আদেশ পালন করাটা শক্ত হইয়া পড়িল। কারণ, একে দুইয়ে অনেকগুলি লোক আসিয়া উহার চারিপাশে জড়ো হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

একটিমাত্র জয়ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া যে-যেখানে ছিল আসিয়া জুটিল ও সমস্বরে জয়কীর্ত্তন করিতে করিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

বিভূতি কাঁপিতে কাঁপিতে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার শুষ্ক কণ্ঠ হইতে আর কোনো ধ্বনি বাহির হইল না।

হরিশবাবু আসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "ছি ছি! কি ক'রলেন বলুন দেখি, বিভূতিবাবু? কুলি ক্ষেপিয়ে মিলটা বন্ধ ক'রে দিলেন?"

বিভূতি তাঁহার পানে চাহিয়া ভাবহীনের মত বলিল, "আমি বন্ধ করলুম ?"

হরিশবাবু তেমনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "না ত কি ? গাল দেবার কি দরকার ছিল ?"

বিভূতি ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিল, "আমি যা ভাল বুঝেছি করেছি। এর জবাবদিহি করতে হয় সায়েবের কাছে করব। বজ্জাত ব্যাটারা তলে তলে সব মতলব ঠিক ক'রে রেখেছিল। আচ্ছা—অমিও বোস কায়েত, দেখি জব্দ করতে পারি কিনা! দুটি দিন, মাত্তর দুটি দিন, না খেতে পেয়ে খিদের জ্বালায় আপনি ছুটে আসবে।"

বিভূতি উঠিয়া সাহেবের ঘরে গেল।

সাহেবের মেজাজ সে দিন ভাল ছিলনা। খুব একটা কড়া ধমক দিয়া তিনি বিভূতিকে বলিলেন, "এখন উপায় ? মিল বন্ধ হ'লে ওরা আগে তোমায় কুকুরের মত গুলি ক'রে মারবে।"

বিভূতির সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

মুখে আস্ফালন করিয়া কহিল, "কাল ত জানিয়েছি আপনাকে। হীরা সিং দেশে চলে যাক, সব গোল চুকে যাবে।"

সাহেব পাইপ টানিতে টানিতে বলিলেন, "না, নতুন কুলি আনালে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা হ'তে পারে। আমি নোটিস দিচ্ছি, তিনদিনের মধ্যে যে কাজে না আসবে তার জবাব হয়ে যাবে। গরীব লোক—চাকরির ভয়ে আপনি আসবে।"

তাহাই হইল। গেটের মাথায় নোটিস-বোর্ড ঝুলাইয়া দিয়া বিভূতি সকাল সকাল বাড়ি ফিরিল।

বাড়ির দুয়ারে কমল দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বিভূতির অকস্মাৎ মনে হইল, এই লোকটাই সব গোলযোগের মূল। কাল উহার

চাকরি গিয়াছে, আজ কুলি ক্ষেপিয়াছে এবং ঐ হতভাগাটা মজা দেখিবার জন্য তাহার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভাল কথা, সাহেবকে বলিয়া উহার শ্রীঘর-বাসের ব্যবস্থা করিলে হয়ত অচিরেই এই গোলযোগের নিষ্পত্তি হইবে।

বিভূতি দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল।

তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া কমল ডাকিল, "শুনুন, শুনুন, বিভূতিবাবু, ও বিভূতিবাবু!"

অগত্যা বিভূতি দাঁড়াইল।

কমল তাহার কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল,—"খুব সাবধান, আপনাকে মারবার জন্য জনকতক কুলি ফিস্ ফিস্ করে পরামর্শ করছিল। একটু দেখে-শুনে চলাফেরা করবেন।"

খপ্ করিয়া কমলের বুকের নিকটে জামাটা ধরিয়া বিভূতি বলিল, "বটে! তুমিও বুঝি ওই দলে?"

কমল মৃদু হাসিল। ধীরস্বরে বলিল, "যে মারে সে কি সাবধান ক'রে দিতে আসে, বিভূতিবাবু!"

বিভূতি উত্তেজনায় আপনার শক্তির মাত্রা বিস্মৃত হইয়াছিল। কমলের জামা ধরিয়া একটা হেঁচকা টান দিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল, "তোমায় পুলিশে দেব। হতভাগা গুণ্ডা কোথাকার, ভয় দেখাতে এসেছ?"

কমল একটুও রুষ্ট হইল না। তেমনি মৃদু হাসিতে হাসিতে বিভূতির হাতে অল্প একটু চাপ দিয়া অনায়াসে জামার প্রান্তটা মুক্ত করিয়া ধীরস্বরে বলিল, "গরীবের জামার উপর অত অত্যাচার করবেন না বিভূতিবাবু গায়ে দু'ঘা মারুন—সে বরং সহ্য হবে।"

কমলের পেশীস্ফীত বলিষ্ঠ বাহুর স্পর্শ পাইয়া বিভূতি দ্বিতীয়বার

আর সেদিকে হাত বাড়াইল না। কোনো উত্তরও তাহার মুখে আসিল না। অক্ষম রোষে অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতে লাগিল।

কমল বলিল, "আমার কর্ত্তব্য, ব'লে গেলুম। যদিও আপনি আমার চাকরি খেয়েচেন, তবু—তবু এ আমার কর্ত্তব্য।"

বলিয়া সে আর দাঁড়াইল না।

বিভূতি পথপ্রান্তে বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তাহার চোখ দুইটা অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল, দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আচ্ছা।"

তারপরে আর বাংলোর দিকে গেল না—বাড়ি ফিরিল।

আজও রোয়াকে মাদুর বিছানো ছিল না—ফরসীতে সাজা তামাকও অভিমানে পুড়িতেছিল না।

রাজ্যের জমা করা ক্রোধ আসিয়া পড়িল বাড়ির এই অনিয়মের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর। বজ্রকণ্ঠে সে হাঁকিল, "লতা!"

পত্নী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বিভূতির অসময়ে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে কথা শুনিবার ধৈর্য্য বিভূতির ছিলনা। যেখানে অধিকারের মাত্রা পূর্ণতর ভাবে বিদ্যমান, সেখানে ধৈর্য্যের বাঁধন রাখা মূর্খতা মাত্র। বিভূতি সজোরে পদাঘাত করিয়া তাহার সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিল। সারাদিনকার পুঞ্জীভূত রোষ এতক্ষণে মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইল।

তারপর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল, তাহার জের চলিল সারা রাত্রি ধরিয়া।

নিজের নিষ্ঠুর আচরণে অনুতপ্ত হওয়ার দরুণ নহে, অচৈতন্য পত্নীর মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া ও রাজদ্বারে আপনার পরিণাম ভাবিয়া বিভূতিকে ডাক্তার ডাকিতে হইয়াছিল।

অতি প্রত্যুষে হতভাগিনী চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

প্রভাতের পিঙ্গলালোক দেখিয়া অভ্যাসবশতঃ সে ধড়মড় করিয়া উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু তলপেটের মধ্যে সহসা টন্ টন্ করিয়া উঠিল—মাথাটা ঘুরিয়া গেল। নিতান্ত অসহায়ের মত বালিশে শ্রান্ত মাথাটি রাখিয়া সে চক্ষু মুদিল।

প্রভাতে কিছু না খাইয়া শুষ্কমুখে বিভূতি আপিসে চলিয়া গেল।

আপিসে কাজ বিশেষ ছিল না। অতবড় মিলটায় মাত্র পনের-ষোল জন বাঙ্গালীবাবু আসিয়াছিল। তাহারা কলম ধরিতেই জানে, যন্ত্র-দানবের আহার্য্য যোগাইতে পারে না।

নোটিসের পানে তাকাইয়া সাহেব বলিলেন, "আর দু'দিন দেখব, তারপর, হীরা সিংকে বিলাসপুরে পাঠানো যাবে। কি বল বোস?" বলিয়া আপনার মোটরে গিয়া উঠিলেন।

বিভূতি সমবেত শুষ্ক মুখগুলির পানে চাহিয়া বলিল, "মিল বন্ধই থাক, আর যাই হোক্, আমাদের কিন্তু রোজ হাজিরা দিয়ে যেতে হবে। জানেন ত চাকরির বাজার, একবার গেলে—"

একবাক্যে ঘাড় দোলাইয়া সকলে সম্মতি দিল।

তার পরদিনও একভাবেই কাটিয়া গেল।

বিভূতি সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া হীরা সিংএর বস্তীর অভিমুখে চলিল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার সবেমাত্র জলস্থল ঢাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। আকাশে কয়েকটি তারা উঠিয়াছে—চাঁদ উঠে নাই। নদীর একটা দিক উঁচু—ভাঙ্গনের দিক বলিয়া। অপর তটে বহুদূর পর্য্যন্ত শুভ্র বালুরাশি বিছানো, অন্ধকারের আবছায়ায় চক্ চক্ করিতেছে।

বালুপ্রান্তরের পারে নিবিড় বন-কুন্তল-রাজি এলাইয়া ছোট্ট গ্রামখানি ইহারই মধ্যে নিষুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বিভূতি উচ্চ তটভূমি দিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। সহসা অন্ধকারের মধ্যে দুইজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিভূতির চিন্তা টুটিয়া গেল। চমকিত হইয়া সে প্রশ্ন করিল, "কে?"

তাহারা কোনো উত্তর না দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তারপর, নদীতীর প্রতিধ্বনিত করিয়া একটা ক্ষীণ আর্ত্ত চীৎকারধ্বনি উঠিল এবং একমুহূর্ত্ত পরে জলে স্থলে তেমনি অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

ভোঁ ভোঁ-ও-ও।

বিভূতি তাড়াতাড়ি চক্ষু মেলিয়া উঠিতে গেল, পারিল না।

মাথায় দারুণ বেদনা, চক্ষু চাহিতে কষ্ট হয়।

অনেকখানি রৌদ্র জানালা দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। মনে হইতেছে পায়ের কাছে কে একজন বসিয়া কোমল করে পরিচর্য্যা করিতেছে। মাথায় পাখা লইয়া কাহার শ্রমক্লান্তহীন কর অবিরাম ব্যজন করিয়া চলিয়াছে।

স্বপ্ন নাই, তবু বিভূতির মনে হইল দীপের রশ্মিটিকে ম্লান হইতে না দিবার ইহাও একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা।

এই সংসারের প্রদীপ তাহার আহুতি লইয়া জ্বলিতেছে। তাই সংসারের জন্য তাহার পরিজনের, তাহার জীবন-প্রদীপটিকে সযতনে রক্ষা করিতে চাহে।

বিভূতি হাঁফাইয়া উঠিল। চক্ষু মুদিয়া ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করিল, "আমি কোথায়?"

কে উত্তর দিল, "আপনার বাড়িতে।"

বিভূতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "কে, হীরা সিং?"

মৃদু সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল, "না, আমি কমল।"

বিভূতি একবার মাথা নাড়িয়া অল্প একটু হাসিল। স্বপ্ন নাকি? পুনরায় সে প্রশ্ন করিল, "মিলের বাঁশী বাজে কেন?"

উত্তর আসিল, "দুপুরের খাওয়ার ডাক পড়েছে ব'লে।"

উত্তেজিত বিভূতি প্রশ্ন করিল, "মিল চলছে? হীরা সিং বিলাসপুর যায় নি? সায়েব, সায়েব—"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর হইল, "আপনি চুপ ক'রে থাকুন। একটু ঘুমোন, নইলে অসুখ বাড়বে।"

বিভূতি ছটফট করিতে লাগিল।

—"আমায়—আমায় আপিস যেতে হবে। হোক বন্ধ, যেতে হবে। শালারা ধর্ম্মঘট করেছে, আমিও দেখব—"

কমল ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আর মিলে যেতে হবে না, আপনি চুপ ক'রে ঘুমুন। মা, ওষুধটা এক দাগ ঢেলে দিন ত।"

ঔষধ খাইয়া বিভূতি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

সে তখন স্বপ্নেও মনে করে নাই—চার দিন হইল সে আঘাত পাইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়ে ও কমলের সাহায্যে বাড়ি আসে। চার দিনের পর এই মাত্র সে প্রথম চক্ষু চাহিল ও কথা কহিল।

মিল খুলিয়াছে। সর্দ্দারকে বিলাসপুর যাইতে হয় নাই। তিন দিনের দিন অন্নগতপ্রাণ কুলিরা দলে দলে আসিয়া যোগদান করিয়াছে

এবং কার্য্যক্ষতির ভয়ে সাহেব হরিশবাবুর শ্যালককে বিভূতির পদে নিযুক্ত করিয়া হরিশবাবুর দারুণ দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন।

বিভূতিকে সাহেব ভালবাসিতেন সত্য, কিন্তু হরিশবাবু তাঁহাকে যে মুহূর্ত্তে বুঝাইয়া দিলেন, অতর্কিত আঘাতে সে চিরদিনের জন্য কর্ম্মক্ষমতা হারাইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে তিনি নূতন কর্ম্মিষ্ঠ লোক নিয়োগ করিয়াছেন।

যন্ত্র-দানব কর্ম্মের মূল্যে স্নেহ ভালবাসার পণ্য ক্রয় করিয়া থাকে।

ভোঁ—ভোঁ করিয়া বাঁশী বাজিতে লাগিল।

বিভূতি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কে জানে?

নারী ও পরশু

শান্তিপুর হইতে সোমবারের সকালে যে ট্রেনটা কলিকাতায় আসে তাহাতে সপ্তাহান্তিক টিকিটধারীর সংখ্যাই বেশি। যাত্রীর ভীড় বেশি হইলেও ট্রেনে কোলাহল থাকে কম। কারণ রবিবারে সাংসারিক বহু কর্ম্ম শেষ করিতে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আলাপ ও পরিচয় ঝালাইয়া লইতে, পরিজনের কাহাকেও আদর, কাহাকেও নূতন জিনিষ কিনিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি, আগামী শনিবার বাড়ি আসিবার কালে শহর হইতে যে-সব জিনিষ আসিবে তাহার ফর্দ্দ তৈয়ার ইত্যাদিতে রাত্রি একটু গভীর হইয়া পড়ে; অতঃপর শয়ন মাত্রই যে নিদ্রা আসে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নিজের হক সীমানায় অনধিকারপ্রবেশ নিদ্রাদেবী পছন্দ করেন না। ট্রেনে আসিয়া বসিলেই তিনিও দুটি চোখে চাপিয়া বসেন। সুতরাং কোলাহলের পরিবর্ত্তে শান্তিই বিরাজ করে ট্রেনখানিতে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল ধরিয়া নিদ্রাদেবীর একাধিপত্য থাকে; তার পর দৈনিক যাত্রীদের কোলাহলে সপ্তাহগামীদের সঙ্কুচিত হইয়া বসিতে হয়; নিদ্রা যায়, থাকে আলস্য। খানিক চাহিয়া, খানিক চোখ বুজিয়া, খানিক পা তুলিয়া, খানিক বা বেঞ্চে দেহ এলাইয়া সেই নিদ্রাজড়িত আলস্য-উপভোগ দেখিবারই জিনিষ। কিন্তু নিষ্করুণ হালিশহর ষ্টেশনে পৌঁছিতেই—সেটুকুর শেষ হইল। গাড়ীর দুয়ার খুলিয়া জন-তিনেক লোক দুটি স্ত্রীলোককে উঠিবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাড়া দিতে লাগিল।

এই সব ছোটখাট ষ্টেশনে অল্পদূর হইতে আগত ট্রেনও এক মিনিটের বেশি থামে না, অথচ স্ত্রীলোক দুটির প্ল্যাটফরম ত্যাগ করিবার বিশেষ

তাড়া দেখা গেল না। আহ্বানকারী লোক তিনটি স্ত্রীলোক দুটির গজেন্দ্রগমনে যেন ক্ষেপিয়া গেল এবং উহারই মধ্যে জন-দুই গাড়ী হইতে নামিয়া ছুটিয়া স্ত্রীলোক দুটির নিকটে গেল ও কোন কথা না বলিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া ট্রেনে তুলিল।

ট্রেনে ত তুলিল, স্ত্রীলোক দুটিও তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকারে যাহার চোখে যতটুকু তন্দ্রা লাগিয়া ছিল এক নিমেষে দূর হইয়া গেল এবং সকলেই খাড়া হইয়া বসিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কি, কি, ব্যাপার কি ?

লোকগুলির চেহারা কাল। কাল হইলেই তাহারা যে মজুরশ্রেণীর হইবে এমন কথা নহে, কিন্তু সত্য বলিতে কি তাহারা ওই শ্রেণীরই। কেহ চাষী, কেহ হয়ত পাটকলে মজুর খাটিয়াও থাকে। কাল, বেঁটে এবং কথাবার্ত্তায় গ্রাম্যসুলভ কর্কশত্বও যথেষ্ট। স্ত্রীলোক দুটির মধ্যে একটির বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে, আর একটি যুবতী—কোলে তার মাস-ছয়েকের একটি শিশু—কোলাহলে ও ক্রন্দনে হয়ত ভীত হইয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া স্তন্যপান করিতেছে। দু-জনেরই কাপড় অত্যন্ত ময়লা, মাথার চুলগুলিরও তেমন যত্ন নাই। অভাবে ও অপরিষ্কারে দেহের লালিত্য ত নাই-ই—বয়স অনুমান করাও দুঃসাধ্য। কাঁদিতেছিল দুই জনেই। বুড়ি কাঁদিতেছিল—তাহাকে টানিয়া ট্রেনে তোলা হইয়াছে—হাতে পায়ে সামান্য চোট লাগিয়াছে সেই জন্য—বউটির কান্না অন্য ধরণের। বুড়ি কিছুক্ষণ কাঁদিয়া সঙ্গীদের গালি দিয়া চুপ করিল, বউটি কিন্তু কাঁদিতেই লাগিল। যতক্ষণ নৈহাটী ষ্টেশন না আসিল, ততক্ষণ সে রোদনের মর্ম্মার্থ কেহই গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

নৈহাটী আসিতেই সন্দেহের নিরসন হইল। লোক তিনটি নামিল, বুড়িও বিনা আপত্তিতে নামিল ও বউটিকে নামিতে বলিল। কিন্তু ছেলে

কোলে চাপিয়া বউ এবার তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো আমায় কেটে ফেলবে গো, আমায় কেটে ফেলবে।

আর একবার ট্রেনের সকলে সচকিত হইয়া উঠিলেন। বউটির চীৎকারে তিনটি লোকই অস্থির হইয়া উঠিল, কেহ বউটির হাত ধরিয়া নামাইবার চেষ্টা করিল, কেহ বা কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল কবিয়া বউটিকে সান্ত্বনা দিবার ছলেই যেন কহিল, ভয় কি, নেমে এস না।

বউ কিন্তু এক ভাবে জানালার কাঠ চাপিয়া ধরিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, ওগো আমায় কেটে ফেলবে গো, আমায় কেটে ফেলবে।

প্ল্যাটফরমে লোক জমিয়া গেল, অদূরে রেলওয়ে পুলিশের লাল পাগড়ি দেখা গেল—কামরার লোকগুলিও সমস্বরে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—কি, ব্যাপার কি?

লোক তিনটি বউয়ের চীৎকারে স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং মনে মনে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হইলেও সে ক্রোধ প্রকাশ করিল না। একবার হালিশহর হইতে টানিয়া বউটিকে উহারা ট্রেনে তুলিয়াছে, পুনরায় বল প্রকাশ না করিলে সাধ্য কি উহাকে নামায়। চারি দিকের গোলমালের মধ্যে শেষ চেষ্টা স্বরূপ বউটির হাতে উহারা হেঁচকা টান দিল। বউ তখন প্রাণপণ শক্তিতে জানালার কাঠ চাপিয়া ধরিয়াছে—গর্ত্তের মধ্যে মুখ লুকাইলে সাপের যে অবস্থা হয়, সেইরূপ। যদিও উহাদের টানাটানিতে বউয়ের ডান হাতখানি ছিঁড়িয়া যায় তথাপি ট্রেন হইতে বউকে যে নামাইতে পারিবে সে ভরসা কম। এদিকে দর্শকেরা লোকগুলির উপর রুখিয়া উঠিতেই উহারা বউটির হাত ছাড়িয়া পুনরায় অনুনয়-বিনয় সুরু করিল, ওগো বাছা, তোমার পায়ে পড়ি নাম। ব্যগ্রতা করি নাম।

বউ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—ওগো কেটে ফেলবে গো কেটে ফেলবে।

এক জন বলিল, তবে একটু চুপ করে ব'স, আমি তোমার টিকিট নিয়ে আসি। বলিয়া সে সরিয়া পড়িল। দেখা গেল, তাহার সঙ্গীরাও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, টিকিট লইয়া কেহ ফিরিল না।

যথাসময়ে ঘণ্টা বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িল এবং কামরার মধ্যে বউ পুনরায় ঘোমটা টানিয়া নিশ্চিন্ত মনে ছেলেকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল।

এত বড় একটা ঘটনার পর বউ নিশ্চিন্ত হইতে পারে, ট্রেন-যাত্রীরা চোখ বুজিয়া থাকেন কি করিয়া? কি করিয়া পরম আরামে পান চিবাইতে চিবাইতে তাঁহারা ছিন্ন কাহিনীর সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হন বা তাস পাতিয়া 'সেতু' রচনায় মনোনিবেশ করেন? সকলেই বউটির মুখের পানে চাহিয়া সকাতরে, সবিনয়ে ও সনির্ব্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন।

বউ কাহারও প্রশ্নরাশির প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া পাশের বর্ষীয়সী হিন্দুস্থানী মহিলার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলিতে লাগিল।

বোঝা গেল হিন্দুস্থানী মহিলাটি বাংলা বোঝেন ভাল এবং অন্যান্য যাত্রীর মত এই ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহারও কৌতূহল কিছুমাত্র কম নহে।

হিন্দুস্থানী রমণীর পানে বউ যখন মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছে ও ঘোমটা অল্প নামাইয়া অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিয়া চলিয়াছে, তখন আসল খবর বাহির হইতে মিনিটখানেকও বিলম্ব হইবে না। প্রবল জলোচ্ছ্বাস বাঁধ বাঁধিয়া কতক্ষণ রাখা যায়। প্রথমে বাঁধের তলদেশ চোয়াইয়া জল গড়াইতে থাকে, তার পর হুহু শব্দে বন্যা আসে। ট্রেনস্থ লোকগুলির

কৌতূহলের ফসল—বন্যাবেগ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে আশাতীত রূপে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

হিন্দুস্থানী রমণী বউয়ের কাহিনী শুনিয়া ট্রেনস্থ সকলের প্রশ্নের যে-ভাবে উত্তর দিলেন, তাহাতে বোঝা গেল, বাংলা বলার ক্ষমতা উঁহার আছে এবং স্ত্রীলোক হইয়া স্ত্রী-হৃদয়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দক্ষতাও কোন বঙ্গরমণীর চেয়ে কম নহে।

বউয়ের নাম সুশীলা। বাপের বাড়ি সোদপুর। বাপের অবস্থা মোটেই সচ্ছল নহে। পাটের কলে কাজ করিয়া যাহা পায় তাহাতে বৃহৎ পরিবারের কোনক্রমে দিনগুজরান হয়। মেয়েরাও কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকে। না করিলে এক বেলা উপবাস সুনিশ্চিত। যেমন অন্যের বাড়ি ধান ভানা, ডাল তৈয়ারী করা, গোবর কুড়াইয়া ঘুঁটে তৈয়ার ও বিক্রয়, কোন গৃহস্থবাড়িতে কলসী করিয়া গঙ্গাজল যোগানো ইত্যাদি। দিন না চলিলেও মেয়ের বিবাহ না দিলে চলে না। সুতরাং নৈহাটী-নিবাসী পাটকলের মজুর ঘনশ্যামের সঙ্গে বিনা-পণে সুশীলার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ হইবার পর জানা গেল, ঘনশ্যাম ইতিমধ্যে দুটি পত্নীর পাণিপীড়ন করিয়াছে। একটি মরিয়াছে—আর একটি বর্ত্তমান। যেটি বর্ত্তমান সেটির সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায়—তৃতীয় দারগ্রহণ।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঘরবসত করিতে গিয়া সুশীলা দেখিল, দ্বিতীয়া হাজির হইয়াছে। হয়ত সপত্নীর হাতে সংসার-সাম্রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া বনবাসিনী হইতে সে একান্ত অনিচ্ছুক।

পাটকলের মজুর—সংসার তার সাম্রাজ্যই বটে। তবু বহুজনপরিবৃত

সুশীলার পিত্রালয়ে যে-অভাব অহরহ লাগিয়া আছে, এখানে তার তীব্রতা কিছু কম। সংসারে একপাল ছেলেমেয়ে নাই, নারী-গোষ্ঠীর কালোহল নাই, কলহ নাই, দুই বেলা কি রান্না হইবে বলিয়া মাথা ঘামাইতে হয় না।

ঘনশ্যাম লোকটি নেহাৎ মন্দ নহে। সুশীলাকে আদরযত্ন যথেষ্টই করিল, এমন কি নিজের পকেট হইতে চাবির গোছা বাহির করিয়া বউয়ের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া কহিল, আজ থেকে নিজের সংসার বুঝেসুজে নাও।

সুশীলা নেহাৎ বালিকাবধূ নহে, বলিল—দিদি যদি কেড়ে নেয়?

ঘনশ্যাম হাসিয়া দেওয়ালের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল—কোন কথা কহিল না।

লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল—একখানা চক্‌চকে জিনিষ সেখানে টাঙানো রহিয়াছে—অনেকটা কুড়ুলের মত।

সুশীলা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি?

ঘনশ্যাম হাসিয়া বলিল, ওই দিয়ে পরশুরাম মাতৃহত্যা করেছিলেন—ওর নাম টাঙ্গি। বেজায় ধার ওতে। তোমার দিদি যদি না শোনে ত…বুঝলে—বলিয়া নিজের রসিকতায় টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

ভয়ে সুশীলার মুখ এতটুকু হইয়া গেল। সপত্নীকে সে সহ্য করিতে পারিবে না সত্য, তাই বলিয়া টাঙ্গির ঘা খাইয়া সে বেচারী প্রাণ দিবে! ঘনশ্যামের মনে কি একটুও মায়া নাই, ভয় নাই?

কিন্তু ভাবনার অবসর ঘনশ্যাম তাহাকে দিল না। এমন ভাবে সুশীলাকে আদর করিতে লাগিল—যাহাতে ঐ সব চিন্তার কণামাত্রও আর তাহার মনে অবশিষ্ট রহিল না।

সপত্নীর নাম কাহু—ভাল নাম কাদম্বিনী। সকালে মিলের বাঁশী শুনিয়া ঘনশ্যাম যেই বাহিরে গিয়াছে—অমনই হাসিতে হাসিতে সে সুশীলার ঘরে ঢুকিল। বলিল, কি লো, আদরিণী রাধা, বলি সারা নিশি কাটল কেমন?

স্বামীর আদর পাইয়া সুশীলা তখন সত্যকার সম্রাজ্ঞী হইয়াছে; হাসিয়াই বলিল, মন্দ কি!

কাহু বলিল, মন্দ নয় তা জানি। তৃতীয় পক্ষের কিনা! কিন্তু আমাদের বেলায়ও অমনি আদর, অমনি হাতে চাঁদ তুলে দেওয়া ছিল। তারপর এক দিন—

সে সহসা চুপ করিল।

কৌতূহলী সুশীলা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এক দিন কি?

—সে পরে বুঝবে'খন, এখন ব'লে লাভ কি!

সুশীলার শত অনুরোধেও কাহু মুখ খুলিল না। হাসিয়া বলিল, চাবিটা দে দেখি, ছুখানা পরোটা ভাজি। যা খিদে পেয়েছে!

সুশীলা সবিস্ময়ে বলিল, এই সাত-সকালে পরোটা খাবে?

কাহু বলিল, কি করি বল, আদর খেয়ে ত পেট ভরাই নি—পরোটা দিয়েই পেট ভরাতে হবে। গুণনিধি ঘণ্টা-দুই পরে ফিরবেন, তখন মাথা কুটলেও মুড়ির আধলা মিলবে না।

সুশীলা বলিল, তা যাই হোক, মেয়েমানুষের এত সকালে খাওয়া অলক্ষণ।

হিহি করিয়া কাহু হাসিয়া উঠিল। কহিল, অলক্ষণ! অলক্ষণই ত! এ বাড়িতে সুলক্ষণ করবে কে লো? তুমি? ওরে আমার গিন্নি রে! দেখা যাক কদিন গিন্নীপনা চলে। আর একটি এলে

তুমিও জুলজুল্ ক'রে পরোটার জন্যে চেয়ে থাকবে আর হাত পাতবে। চাবি গিয়ে উঠবে তাঁর আঁচলে।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলিয়া সুশীলা কি বলিতে যাইতেছিল বাধা দিয়া কাহু বলিল, আমার দিকে চেয়ে দেখ দিকি, ধর্ম্মত বল—আমি তোমার চেয়ে কুচ্ছিত কি ?

সত্য বলিতে কি কাহু সুন্দরী। বয়সে সুশীলার চেয়ে কিছু বড় হইলেও তেমন বড় দেখায় না। রং ফরসা, অঙ্গসৌষ্ঠব আছে, পান খাইয়া ঠোঁট দুখানি তার লাল টুকটুকে। ফরসা কাপড় পরে, হাসিয়া কথা বলে। পাটকলের মজুরের স্ত্রী হইলেও কাহু সুন্দরী বটে।

সুশীলার উত্তর না পাইয়া কাহু দেওয়াল হইতে আরসী টানিয়া মুখের সম্মুখে নাচাইতে নাচাইতে বলিল, তোমার চেয়ে আমার রং শুধু ফরসা নয়, নাক টিকলো, চোখ বড়, কপাল ছোট, ঠোঁট পাতলা, চুল কোঁকড়া! তোমার চেয়ে আমার কথা অবশ্য এক দিন মিষ্টি ছিল, আজ নয়। গড়ন? দাঁড়াও ত ভাই, দাঁড়াও না।—বলিয়া আরসী বিছানার উপর রাখিয়া সুশীলাকে সে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

অগত্যা সুশীলা উঠিল।

সে উঠিতেই কাহু হি হি করিয়া হাসিয়া কহিল, ইঃ—তুমি বড্ড ঢেঙা। অন্ধকারে যদি চালের বাতা ধ'রে দাঁড়াও ত....হি—হি—হি।

সুশীলা বিরক্ত হইয়া বসিয়া পড়িল ও ঝাঁঝালো স্বরে বলিল, যাও!

কাহু হাসি থামাইল না, বলিল, যাবই ত। এ বাড়ির মজা কি জান? যেমন হাবা তেমনি দেবী না হ'লে মানায় না—তৃপ্তি নেই। দিদি ছিল আমার চেয়ে সুন্দরী, আমি এলাম এক কাঠি নিরেস, আর তুমি? যেমন হাবা তেমনি দেবী!

সুশীলার বিরক্তির বদলে পুনরায় বিস্ময় জাগিল। কহিল, দিদি কে?

কাদু বলিল, দিদি—দিদি। তোমার—আমার। যিনি পাটরাণী গো। আমি যখন নতুন বৌ এলাম, তখন দিদির আঁচল থেকে চাবি উঠল আমার আঁচলে, আর লুকিয়ে দুখানা পরোটা খাবার জন্যে দিদি এমনি ক'রেই আমার কাছে হাত পাতল! আমি তখন সুয়োরাণী কিনা—তোমার মত গ্যাদারে ভুঁয়ে পা পড়ে না! বললাম, এই তুমি যা ব'ললে গো—'সাত সকালে খিদে—কি অলক্ষণ!' তার পর এক দিন ঘুম থেকে উঠে দেখি চাবি নেই আঁচলে। খোঁজ—খোঁজ। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি, পরোটা তৈরি হ'চ্ছে, তরকারী নেই। শুধু পরোটাগুলো সে সেঁকছে আর গরম গরম খাচ্ছে। কি অলক্ষণ বল ত!

এতক্ষণে কাদুর হাসি থামিল, মুখখানি কেমন যেন থমথমে হইল, গলার হাল্‌কা সুরটি ক্রমশ মৃদু হইয়া আসিল। বলিল, কর্ত্তা বাড়ি এলেন—অমনি বললাম সব কথা। কর্ত্তা খানিক চুপ ক'রে থেকে হাসলে। তারপর দেওয়াল থেকে ওই সর্ব্বনেশে অস্ত্রখানা হাতে নিয়ে আঙুল ঠেকিয়ে ধার দেখতে লাগল। মুখে শুধু বললে, নষ্ট স্বভাবের মেয়েরা চুরি করে শুনেছিলাম—আজ চোখে দেখলাম। আচ্ছা, কাল এর ব্যবস্থা হবে।

কেমন ভয়ে গা কেঁপে উঠল। অনেকক্ষণ ঘুমুতে পারি নি। সকালে উঠে দেখি, ও কলে কাজ করতে গেছে, দিদি নেই। বাড়ি এলে জিজ্ঞাসা করলাম, দিদিকে দেখছি না। হেসে বললে, তাকে আর দেখতেও পাবে না। ওই দেখ—ব'লে দেওয়ালে টাঙানো চক্‌চকে অস্ত্রখানা দেখিয়ে দিলে। বেশি নয়, দুটি ফোঁটা রক্ত ওর গায়ে লেগে

ছিল, ভয়ে হয়ত চীৎকার করতে যাচ্ছিলাম, ও মুখ চেপে ধ'রে শাসনের স্বরে বললে, চুপ, চেঁচিয়েছ কি দিদির সাথী হ'তে হবে। চুরি করার ফল।

কানু চুপ করিল, সুশীলা পাথরের মতই বসিয়া রহিল। ভয়ে তার নিশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। কানুই সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পুনরায় হাসিয়া উঠিল, কাজ কি ভাই চুরি ক'রে ওর শাস্তি ত জানি!

সুশীলা ভয়ে ভয়ে বলিল, তুমি পরোটা খাবে, উনি যদি জানতে পারেন? সে-ও ত চুরি করা!

কানু বলিল, চুরির সাক্ষী কে? তুমি নিশ্চয়ই বলবে না?

মৃদুস্বরে ভয়ে ভয়ে সুশীলা বলিল, না।

—তবে? বলিয়া কানু কি ভাবিতে লাগিল।

সুশীলা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল, তোমাকে ত উনি অত ভালবাসতেন, তোমার এ-দশা হ'ল কেন?

কানু বলিল, দশা মানে—হতশ্রদ্ধা ত? তা কেন হবে না? আমিও ত কম সুন্দরী নই, দিদির স্বভাব যে আমাকেও পাবে না, তা কে বলতে পারে!

সুশীলা বলিল, কি স্বভাব?

কানু বলিল, আঃ নেকি! স্বভাব ভাল নয় আর কি!

সুশীলা বলিল, ও—বউকে সন্দেহ করা এর রোগ তা হ'লে?

কানু খুব জোরে হাসিয়া উঠিল, এতক্ষণ একটু বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ তবু। তবে তোমার কোন ভয় নেই। কেউ তাকাবে না ব'লেই ত সোদপুরের শ্যাওড়াতলা থেকে তোমায় কুড়িয়ে এনেছে গো, সুয়োরাণী!

বার-বার নিজের রূপের নিন্দায় সুশীলা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সরোষে কহিল, তুমি দূর হও।

কাহু যাইতে যাইতে বলিল, ওই বাঁশী বেজে উঠল—শ্যাম আসছেন ঘরে। আজ আর পরোটা খাওয়া হ'ল না, যাই।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সুশীলা সে বিষয় স্বামীকে কিছুই বলিল না। যদিও ঘনশ্যামের কাছে সে ভাল ব্যবহার পাইয়াছে এবং চাবি আঁচলে বাঁধা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছে মানুষটিও তাহার হাতের মুঠায় আসিল, তথাপি ওই পরশুর পানে চাহিয়া ভয়ে সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। হয়ত কাহুর স্বভাবচরিত্র ভাল নহে—সেই দোষে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। মর্ম্মান্তিক ব্যথা না পাইলে কেহ কি অকারণে পত্নী ত্যাগ করিতে পারে?

কাহুর সব কথাই যে সত্য এমন হইতে পাবে না। স্ত্রীর চরিত্রে স্বামীর এই অকারণ সন্দেহ—ইহাতে সংসাবে যে কত অশান্তি আনে। কাজ নাই ঘনশ্যামেব কাছে ওই সব কথা বলিয়া, কাহু যদি চুরি করিয়া দু-খানা পরোটা ভাজিয়া খায়, থাক। ধরা না পডিলেই হইল। মাঝে হইতে সে কেন অশান্তি টানিয়া আনে?

ঘনশ্যাম যদি বলে, বউ—এবাব পূজোয় কি চাই বল? সুশীলা আদরে গলিয়া প্রার্থনা জানায় না—ঢাকাই শাড়ী কিংবা আড়াই-প্যাঁচ তাগা। কখনও সে বলে না, এক দিন নৌকায় চড়াইয়া গঙ্গার ওপারে চুঁচুড়ায় ষাঁড়েশ্বর দর্শন করাইযা আন।

রান্না সে ভাল করিতে পাবে না। স্বামী যে-সব খাদ্যদ্রব্যের নাম করেন সে-সব জিনিষ সে কখনও চোখেও দেখে নাই। সে জানে শাকের কয়েক প্রকার তরকারি; মূলা, বেগুন, আলু, কাঁচকলা আর কুমড়া তার পরিচিত। স্বামীর রুচিবর্দ্ধনে তার অক্ষমতা দিন দিন তাকে

ম্রিয়মাণ করিয়া তুলে। আর দেওয়ালে-টাঙানো ওই পরশু দেখিলেই বুকের স্পন্দন বাড়িয়া উঠে—সারা দেহ কেমন যেন এলাইয়া পড়ে। ওই পরশুর পানে চোখ রাখিয়া স্বামী-সোহাগিনীর অনেক সাধই তাই বুকের তলায় জমাট বাঁধিয়া যায়।

এ-দিকে চাবি পাইয়া কান্থর সাহস বাড়িয়া গিয়াছে। আপন মনে সে ভাঁড়ার খোলে, পরোটা কখনও কখনও লুচির আকার ধারণ করে, কখনও সুজি, চিনি ও ঘি দিয়া মোহনভোগ তৈয়ারী করে, কখনও সবটা আপনি খায়, কখনও বা সুশীলাকে ডাকিয়া ভাগ দেয়।

সুশীলা ভয়ে ভয়ে কান্থর কথা শোনে আর ভাঁড়ারের পানে চাহিয়া ভাবে অতিসতর্ক স্বামী যদি কোনদিন ঘি-ময়দার হিসাব তলব করেন? তখন কি দশা হইবে কান্থর, আর কোথায় থাকিবে সুশীলা?

দেড় বৎসরের মধ্যে তেমন দুর্দিন অবশ্য আসিল না। ইতিমধ্যে সুশীলার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। তাহাকে ভালবাসিয়া ঘনশ্যাম অর্থের মমতা কিছু হ্রাস করিয়াছে। ঘনশ্যামের অন্তরের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষুধা—কুরূপা সুশীলাকে পাইয়া খানিকটা যেন পরিতৃপ্ত হইয়াছে। যখন-তখন তাই সে আদর করিয়া বলে, বউ—যাদের জন্যে সংসার তারা কাছে না থাকলে কি ভাল লাগে? আমি বাড়িঘর ভালবাসি, টাকা ভালবাসি, জমিজমা ভালবাসি—সব আলাদা আলাদা, কিন্তু তোমাকে ভালবেসে মনে হয়, এই সমস্ত জিনিষ আর আলাদা নেই—এক জায়গায় এসেছে। এই ভালবাসার ফল এই সোনার টুকরো। বলিয়া ছেলেকে সে সস্নেহে চুম্বন করে।

এক দিন ভালবাসার কথা উঠিলে সুশীলা কুক্ষণে বলিল, ও-কথা দিদিদের বেলায়ও ত বলতে!

ঘনশ্যাম ঈষৎ আহত হইয়া বলিল, কে বললে এ কথা? কান্থ বুঝি?

সুশীলা ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, বাঃ রে! সে বলবে কেন?

—তবে সে কি বলেছে? বলিয়া ঘনশ্যাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুশীলার পানে চাহিল।

প্রখর দৃষ্টির তাপে সুশীলা শুকাইয়া উঠিল। এত দিন ভাল করিয়া সে স্বামীর পানে তাকায় নাই। আদর-সোহাগের মুহূর্ত্তে চক্ষু মুদিয়া সে সব উপভোগ করিয়াছে, সাংসারিক উপদেশ দেওয়ালের পানে চাহিয়া শুনিয়াছে আর ঘাড় নাড়িয়াছে। ঘনশ্যামের পরিপুষ্ট গোঁফ জোড়ার উপর বসন্তের দাগে ভর্ত্তি ওই চ্যাপ্টা নাক আর তার দু-পাশে আরক্ত বিস্ফারিত চোখ···সুশীলা ভয়ে চক্ষু মুদিল।

ঘনশ্যাম সেদিন আর কোন কথা না বাড়াইয়া সুশীলাকে আদর-সোহাগ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়া বলিল, ভাঁড়ারের চাবিটা আমায় দাওত। ও-বেলা জিনিষপত্র মিলিয়ে কিনে আনতে হবে।

যন্ত্রচালিতের মত সুশীলা ঘনশ্যামের হাতে চাবি তুলিয়া দিল।

ঘনশ্যাম চলিয়া গেলে কানু হাসিতে হাসিতে দেখা দিল, কই গো সুয়োরাণী, চাবিটা দেখি?

কানুকে দেখিয়া ভয়বিমূঢ় সুশীলার রাগ হইল। ইহার জন্যই ত যত হাঙ্গামা। স্বামী আজ সন্দেহ করিয়া চাবি লইয়া গিয়াছেন, জিনিষপত্রের হিসাব লইতে গিয়া যদি অনর্থপাত না-হয় ত সুশীলার নামই মিথ্যা।

কানু সুশীলার ভ্রূকুটি দেখিয়া আপন স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল, শরতের আকাশে মেঘ কেন গো, রাধে? চাবিটা দাও।

সুশীলা রাগিয়া বলিল, আর লুচি-পরোটা খেতে হবে না, যার চাবি সে নিয়ে গেছে, আজ বিকেলেই হিসেব মেলাবে।

—বটে?

—বেরুবে লুকিয়ে খাওয়ার মজাটা !

কাহু গম্ভীর হইল না, তরল কণ্ঠে বলিল, মানে টাঙি দিয়ে মাথাটা কচাৎ ক'রে কেটে ফেলবে ? তা ফেলুক গে, দিদির মত না খেয়ে মরব না ত ! সে বড় বালাই যে লো । ও হাতের সুখে মাথা কাটবে, আর চিংড়িমাছের মত বেরুবে না এক ফোঁটাও রক্ত ! দূর, দূর, দিদিও যেমন ! হাসিতে হাসিতে কাহু চলিয়া গেল ।

দুপুরে হিসাব তলব হইল না, সন্ধ্যার পর ভাঁড়ার খুলিয়া ও খাতা মিলাইয়া ঘনশ্যাম সুশীলাকে ডাকিল ।

সুশীলা কাঁপিতে কাঁপিতে ঘনশ্যামের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে সে বলিল, কত দিন থেকে এ-ব্যবসা চলছে ?

সুশীলা কথা কহে না দেখিয়া ঘনশ্যাম রুখিয়া উঠিল, তবু চুপ ক'রে রইলে ? মেয়েমানুষ কুকুরের জাত, লাথি না মারলে সিধে হয় না কিনা ? বলিয়া বোধ হয় লাথি মারিবার জন্যই আগাইয়া আসিল । সুশীলা কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল ও ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল ।

ঘনশ্যাম লাথিটা আর তাহার গায়ে মারিল না, মেঝেয় পা ঠুকিয়া বলিল, বল্ হারামজাদী, কে ক'রত এই সব ? এই চুরি ?

দেওয়ালে চকচকে টাঙ্গি টাঙ্গানো রহিয়াছে, ঘনশ্যামও এমন কিছু দূরে দাঁড়াইয়া নাই, একবার হাত বাড়াইলেই হইল । সুশীলা ত চিংড়িমাছ নহে যে কাটিলে এক ফোঁটা রক্ত বাহির হইবে না, বিশেষ করিয়া এত দিন লুচি পরোটা ও মোহনভোগের আস্বাদ সে ও কোন্ না লইয়াছে ! অঙ্গে শ্রী না হউক, দেহে রক্ত ও মাংস কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে ত ! সেই রক্ত ও মাংসের মায়াতেই সুশীলা কাঁদিতে কাঁদিতে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, আমি না, দিদি ।

—কে ক'রত ? চাবি পেত কোথায় ?

সুশীলা বলিল, আমার আঁচল থেকে খুলে নিত জোর ক'রে। বারণ করলে শুনত না।

—আমায় বলিসনি কেন এত দিন ? অ্যাঁ, আমায় বলিসনি কেন ?

—তোমার দিব্যি দিয়ে বারণ করেছিল যে !

অম্লান বদনে সুশীলা মিথ্যা কথা বলিল।

অভাব ও অশিক্ষার মধ্যে সে বরাবর মানুষ হইয়াছে। পরের গাছের লাউ কুমড়া বা আম জাম কত চুরি করিয়াছে, ভোজবাড়ি হইতে জঞ্জাল ফেলিবার ছলে তরকারির খোসার মধ্যে লুকাইয়া মাছের টুকরা সে বাড়িতে আনিয়াছে ; কাপড় ঢাকা দিয়া ক্ষীরের ভাঁড় আনিয়াছে ও নির্জ্জন কলাতলায় দাঁড়াইয়া চুমুক দিয়া সবটা খাইয়াছে। মিথ্যা কথা এত বলিয়াছে যে সত্য কথা কি বস্তু তাহা সুশীলার সত্য সত্যই জানা নাই। আপনাকে বাঁচাইতে সে যে কানুর স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইবে—তার আর আশ্চর্য্য কি !

ঘনশ্যাম আষাঢ়ের মেঘের মত থমথমে চোখে দেয়ালের পানে চাহিল ; খানিক আগাইয়া আসিয়া টাঙ্গিখানি হাতে তুলিয়া আঙুল দিয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিল, অতঃপর যেন কিছু হয় নাই এমন ভাবে সেখানা যথাস্থানে রাখিয়া বলিল, যাও—উঠে রান্না করগে। আজ সকাল সকাল খেয়ে একটু ঘুমুবো। কাল ভোরবেলায় ডিউটি আছে।

রান্না যা করিল সে সুশীলাই জানে। কোনটায় নুন পড়িল না, কোনটায় ঝাল দিল বেশি ; ডাল ধরিয়া একটু গন্ধও বাহির হইয়াছিল বইকি !

কিন্তু খাইতে বসিয়া ঘনশ্যাম অণুমাত্র অনুযোগ করিল না। অন্য দিন খুঁত ধরিয়া অনেক জিনিষ পাতে ফেলিয়া রাখে, আজ পরিতোষ সহকারে ডাল, তরকারি. ভাত চাহিয়া চাহিয়া খাইল। খাওয়া শেষ হইলে সুশীলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, ঘরে এসে আলো জ্বেল না যেন, আমি ঘুমুব।

ইতিমধ্যে কানুর সঙ্গে সুশীলার কয়েক বার চোখাচোখি হইয়াছে, কিন্তু সুশীলা ভয়ে কি লজ্জায় কথা কহিতে পারে নাই। তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও সাবধান করিয়া দিতে পারে নাই যে আজ আবার ঘনশ্যাম টাঙ্গিতে হাত দিয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিয়াছে। ভাবিল, একই বাড়িতে এত কাণ্ড হইয়া গেল—কানু কি কিছুই শোনে নাই? কিছুই বোঝে নাই?

পরদিন প্রাতঃকালে সুশীলা বুঝিতে পারিল, কানু সবই শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে। না বুঝিলে এতক্ষণ সে হাসিতে হাসিতে আসিয়া হয়ত বলিত, কি লো সুয়ো, কাল রাত্তিরে মানের পালা জমল কেমন? বলি দুয়োরাণীর কি হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা?

যাক, বাঁচা গিয়াছে কানু পলাইয়াছে। না পলাইলে....হঠাৎ সুশীলার বুকখানা গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মনে পড়িল কানুর কথা, সকালে উঠে দেখি ও কলে কাজ করতে গেছে, দিদি নেই।....আর টাঙ্গিতে দু-ফোঁটা রক্ত!

ছুটিয়া সুশীলা শোবার ঘরে গেল ও হিড় হিড় করিয়া টুলখানা টানিয়া যে দেওয়ালে টাঙ্গি টাঙ্গান ছিল—সেইখানে আনিল। তার পর টুলের উপর উঠিয়া সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টাঙ্গির পানে চাহিল। না, চক্‌চকে অস্ত্রখানির কোথাও শোণিতচিহ্ন নাই। প্রভাতের আলোয় সে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা নিষ্কলঙ্ক শোভায় দীপ্যমান।

তবু বুকের স্পন্দন থামিতে চাহে না, মনের সন্দেহ ঘোচে না।

কম্পিত হাতে অস্ত্রখানি তুলিতে গিয়াই সুশীলার নজর পড়িল তার বাঁটের দিকে। প্রভাতের উজ্জ্বল আলোয় দৃষ্টি তাহার প্রতারিত হইল না। অদৃশ্য জীবাণু যেমন অণুবীক্ষণের সাহায্যে স্পষ্টতর হইয়া উঠে তেমনিই ওই দু ফোঁটা ফ্যাকাসে রক্ত পরশুর কাঠের বাঁটে লাগিয়া আছে। কাদুর রক্ত! হতভাগিনী কাদুর রক্ত!

চীৎকার করিয়া সুশীলা টুল হইতে পড়িয়া গেল।

* * *

কতক্ষণ পরে জানে না, জ্ঞান হইতেই সে চোখ মেলিয়া দেখিল সারা ঘরখানি লাল হইয়া গিয়াছে। পরশুর গা বহিয়া রক্ত ঝরিতেছে, টুল রক্তে মাখা। সুশীলার কাপড় কেশ, হাত ও গহনা সবই লাল। আকাশের কোলে আরক্ত সূর্য্য গাছের মাথা ও বাড়ির ভাঙা প্রাচীর রাঙাইয়া আকাশেও যেন আগুন ধরাইয়া দিয়াছে।

কাদুর দিদি গিয়াছে, কাদু নাই—এবার পালা সুশীলার। ওই নারী-শোণিত-লোলুপ পরশু অত্যুগ্র ক্ষুধায় শাণিত দৃষ্টিতে যেন সুশীলার পানে চাহিয়া আছে! যুগ-যুগান্তরের তৃষ্ণা উহার নিষ্ঠুর ইস্পাত-পিচ্ছিল ঝক্‌ঝকে দেহে দ্বাদশ সূর্য্যের জ্যোতিতে জ্বলিতেছে।

সুশীলা আর অপেক্ষা করিল না। দুই বাহু বাড়াইয়া সুপ্ত শিশুকে কোলে টানিয়া লইল ও তাহার অকাল-নিদ্রাভঙ্গজনিত চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল।

বিনোদ-অপেরা পার্টি

মাঘী পূর্ণিমায় অন্নপূর্ণা পূজাটা এই গ্রামের আর সব উৎসবকে ছাড়াইয়া যায়। পূজাটা বারোয়ারি বলিয়া প্রতিমাকে তিনটি দিন রাখিয়া যাত্রা, থিয়েটার, কালীকীর্ত্তন ইত্যাদি ধুমধামের ব্যাপার চলে। পুরাকালে থিয়েটারের বদলে বাইনাচ চলিত—এখনকার ছেলেরা উন্নাসিক আপত্তির সঙ্গে ওটি বাতিল করিয়া দেওয়াতে কোন কোন বৃদ্ধ আক্ষেপ করিয়া থাকেন। যাহা হউক—এবার মন্বন্তরের যে ঘূর্ণী বহিয়া গেল—তাহাতে এই গ্রামখানির কিছু-না-কিছু ক্ষতি হইয়াছে। তাহা হইলেও, যাহারা আছে—উৎসব তাহারা ভাল ভাবেই জমাইতেছে। গঞ্জের ব্যবসায়ীরা মোটা রকম চাঁদা দিয়াছে, খুচরা দোকানীরা এবং গৃহস্থেরা যথাসাধ্য অর্থানুকূল্য করিয়াছে; যাহারা অর্থ দিতে পারে নাই—তাহারা দিতেছে শ্রম। ছেলেদের উৎসাহ প্রবল, যাত্রার বদলে আরও এক রাত্রি থিয়েটার হইবার কথা ছিল, কিন্তু অশিক্ষিতরা মাচা বাঁধা ও ন্যাকড়ার ছবি আঁকা দৃশ্যের মর্য্যাদা এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের ক্রিয়াকলাপ ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। আবার সখের থিয়েটার পার্টিরাও মাঘের শীতে সামাজিক বইয়ে আপত্তি জানায়। সেকেলে বলিয়া ঠিক নহে, কিন্তু পৌরাণিক বইয়ের কতকগুলি ভূমিকায় (যথা—মাকুতি, ঘটোৎকচ, নারদ প্রভৃতি) নামিতে অনেকের ঘোরতর আপত্তি দেখা যায়। দুই-একজন রাজা সেনাপতি ছাড়া—দাড়ি, নামাবলী, রুদ্রাক্ষ, গেরুয়া, জটা প্রভৃতির প্রাবল্য ওই বইগুলিতে দেখা যায়। সেই জন্য সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া—এক রাত্রি যাত্রার ব্যবস্থা আছে। থিয়েটারে বেশি খরচ হয় বলিয়া যাত্রাতে ব্যয়সঙ্কোচ অবশ্যম্ভাবী। চলনসই গোছের একটি দল এবার বায়না করা হইয়াছে।

মাঘের প্রকৃতিতে বৃষ্টির হুমকি আছে—বিশেষ করিয়া পূর্ণিমার মুখে। কতবার যাত্রার আসরে প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, এবং স্টেজ বাঁধা হইয়া থিয়েটার যথাসময়ে আরম্ভ হয় নাই। কর্ত্তারা ঠিক করিয়াছেন, যাত্রাটা এবার দিনের বেলায় শেষ হইয়া যাক। আহারাদির পর অর্থাৎ বেলা এগারোটা-বারোটা নাগাত যাত্রা বসাইলে সন্ধ্যার মুখেই শেষ হইবার কথা। এ তো আর সেকাল নহে যে—এক পাল ছোকরা বা শামলা পরা জুড়ির কান-ফাটানো তানের উৎপীড়নে আসল পালাটিকে মনের ত্রিসীমানা স্পর্শ করিতে না দেওয়া! বেহালাদারের রাগ-বিস্তারের অবসরও কম। ছয় ঘণ্টার বেশি একটি পালা সুস্থির হইয়া শুনিবার ধৈর্য্যবান শ্রোতারও অভাব। দিনের বেলায় যাত্রা—যাত্রাওয়ালারা একটু আপত্তি জানাইয়াছিল। তা পয়সা দিয়া যাহাদের আনা হইয়াছে, তাহাদের মতামতের মূল্যই বা কি।

যতীন হাজরা বলিল, ওসব হবে না অধিকারী, তোমরা এলে দশটার ট্রেনে—সারা দিন ঘুমিয়ে কাটাবে—আর আমাদের সাজানো আসর মাটি করে দেব—

যাত্রার নাম বিনোদ-অপেরা পার্টি। স্বত্বাধিকারী বিনোদ গড়াই। কালো রঙের দোহারা চেহারার মানুষটি, মাথায় টাকের দু'পাশে বাবরী-চুলের চিহ্ন আছে—সুগোল মুখে আছে প্রকাণ্ড এক জোড়া গোঁফ, এবং গোঁফের ঊর্দ্ধে বর্ত্তুলাকার দু'টি চোখ। ধূর্ত্তামিতে সে চোখের তারা অর্দ্ধ স্তিমিত। কথা বলে চিবাইয়া চিবাইয়া। কহিল, আমরা মাটি করবো—আসর!

যতীন হাজরা বলিল, তোমরা কি আর করবে, ওই দেখ। বলিয়া আকাশের দিকে আঙুল উঁচাইল।

দিনের বেলায় তো হতে পারে—

সন্ধ্যের আগে নামবে বলে মনে হয় না। নাও চট্‌ পট্‌ করে—এক ঘণ্টার মধ্যে আরম্ভ করা চাই।

অধিকারী একবার আকাশের দিকে, একবার আসরের দিকে চাহিল। আকাশের মত আসরও প্রকাণ্ড। সবটা সামিয়ানায় ঢাকা পড়ে নাই। বাখারির বেড়ায় খাস আসরটি চিহ্নিত; তাহার বাহিরে বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া দরমা, ছেঁড়া চাটাই বা চট পাতা। আসরের গণ্ডিমাঝে বাঁশের খুঁটিগুলি দেবদারু ও কামিনী পাতায় মোড়া এবং সেগুলির মধ্যভাগে ছবি টাঙানো। কাগজ আক্রা বলিয়া নিশান বা শিকলের বাহার নাই। আসরের মাঝখানটায় সাদা চাদর ধব ধব করিতেছে—লোক সেখানে এখনও জমে নাই। পাশের মাদুরে বা দরমায় কম পদমর্য্যাদাবানেরা কিছু কিছু জমিয়াছে। যাত্রাটা তাহাদের কাছে উপভোগের বস্তু।

কর্ম্মকর্ত্তা হাজরার পানে চাহিয়া অধিকারী বলিল, আমরা আসছি অনেক দূর থেকে। কাল রাতে খাওয়া হয় নি, ঘুমও না। দু'টি না খেয়ে তো—

বেশ তো তাড়াতাড়ি যা হয় কিছু করে নাও না।

আপনারা যদি ব্যবস্থা করে দেন—

আমরা! হাজরা কয়েক মিনিট অধিকারীর মুখের পানে চাহিয়া অদূরে কর্ম্মব্যস্ত এক যুবককে ডাকিলেন, হরিপদ, শোন তো। যাত্রার দল যখন বায়না কর, তখন কি সর্ত্ত করেছিলে?

হরিপদ জামার বুক পকেট হইতে একখানি ভাঁজ করা কাগজ টানিয়া বাহির করিয়া কহিল, দাঁড়ান, পড়ে শোনাচ্ছি।

হাজরা হাত তুলিয়া কহিল, টাকার কথা নয়, আমি চাইছি—ওদের খোরাকী—

হরিপদ কহিল, ওসব হাঙ্গামা আমাদের নেই। ইনক্লুডিং এভরিথিং।

হাজরা বলিল, বাংলাতেই বল, বুঝতে পারবো।

মানে আমরা দেব নগদ টাকা—ওরা করে যাবে যাত্রা। পান, সিগারেট, বিড়ি, চা, খাবার, জলখাবার, গাড়ীভাড়া ইনক্লুডিং—মানে ওরই মধ্যে সব।

তবে? হাজরা চোখ পাকাইয়া অধিকারীর পানে চাহিল।

অধিকারী মুখ নামাইয়া কহিল, বিদেশে কোথায় কি পাওয়া যায় না-যায় সে ব্যবস্থা—

হরিপদ বলিল, সে সব আমরা করে দিচ্ছি—টাকাটা শুধু বায়না থেকে বাদ যাবে। বলিয়া হাঁক দিল—অবনী, নিরাপদ, শ্যামা—

কোথা হইতে তিন মূর্ত্তি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, কি বলছেন হরিপদ-দা?

এই যাত্রাদলের খাবার ব্যবস্থাটা তোমাদের হাতে। চাল, ডাল, মশলা, মাছ যা যা দরকার আনিয়ে দাও। ভাল কথা, ঘি, ময়দা এখানে পাওয়া যায় না।

অধিকারী কহিল, লুচি ভেজে খাবার সময় নেই—সখও নেই। চাল, ডাল আনিয়ে দিন।

হরিপদ বলিল, কিন্তু রান্না আপনাদের করে নিতে হবে। মানে সবাই যাত্রা শুনবে কিনা—ওসব হাঙ্গামায় কেউ যেতে চাইবে না।

তা তো নেব, এক ঘণ্টার মধ্যে যাত্রা বসাবেন কি করে?

আরে ঢোলকটা তো পিটে দিন—লোক জমতে থাকুক, আপনারাও একে একে খেয়ে আসরে নামতে থাকুন। কি কি চাই বলুন? কতজন আছেন? তিরিশ? মাত্তর তিরিশ জন? চাল কত ধরবো, দশ সের?

রক্ষে করুন মশাই—ডাল আছে, খিচুড়ি বানিয়ে নেব’খন।

আচ্ছা। বেগুন ভাজা, খয়রা মাছ ভাজা—

রক্ষে করুন মশাই, মাছে আর কাজ নেই। বায়নার টাকা সবই তো পেটপুজোয় রেখে যেতে পারি না।

তবে যা ভাল বোঝেন এদের বলে দিন। কড়া, বালতি, হাঁড়ি পাঠিয়ে দিই গে।

হাজরা বলিল, ঠিক বারোটায় সং নামানো চাই। এখন বরঞ্চ ঢোলকে ঘা দিয়ে দাও গে।

অধিকারী দলের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। একটা অশ্বত্থ গাছতলায় একখানি গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। তার উপর লেবেলমারা কয়েকটি পোষাকের বাক্স। বহুদিনের পুরাতন বলিয়া কাঠের রং লুপ্ত, এবং চুণ খয়েরের দাগে বিচিত্রিত—বহুস্থানে উঠা-নামার জন্য পেরেক খসিয়া নড়বড়ে হইয়াছে। যাত্রার দলের কয়েকজন লোক বাক্সগুলি গাড়ী হইতে নামাইয়া যেখানে রাখিতেছে সে একখানি আধভাঙ্গা চালা ঘর। দাওয়াটা ধ্বসা, দেওয়ালগুলি ফাটা এবং চালার ফুটা দিয়া আকাশকে বহু নীল-বিন্দুতে শোভাময় দেখায়। বৃষ্টি ঠেকাইবার ক্ষমতা তাহার হয় তো নাই। কিন্তু সাজঘরের জন্য সুবিধামত অন্য ঘরও আসরের কাছে পাওয়া মুশকিল। পাশেই কালকাসুন্দা ও গোয়ালেলতা-ভরা যে জমিটুকু আছে তাহার খানিকটা ইতিমধ্যে পরিষ্কৃত হইয়া রান্নার ব্যবস্থা হইতেছে। গরুর গাড়ীর চারিপাশে অর্দ্ধোলঙ্গ ছেলে-মেয়ের ভিড়। কয়েকজন গ্রাম্যলোক হাঁ করিয়া যাত্রার দলের লোকগুলিকে দেখিতেছে। কিন্তু কিই-বা আছে দেখিবার! সাজ-পোষাক গায়ে না চাপানো পর্য্যন্ত তাহারা এমন কিছু বিস্ময়ের বস্তু নহে। রাজার মত রং বা রাক্ষসের মত স্বাস্থ্য—তাই কি একজনেরও আছে!

বালক কৃষ্ণের মাধুর্য্যমাখা মুখ কিংবা রাণীর রূপলাবণ্য—না, ইহারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের চেয়েও বেশি রোগা, বেশি কালো এবং বেশি ক্লান্ত। তৈলাভাবে চুল রুক্ষ, নিদ্রা ও আহারাভাবে মুখচোখ শুক্‌না, অনেকখানি পথ হাঁটিয়া আসায় পায়ে ধূলা এবং পরিচ্ছদ মলিন। কিন্তু কেন ইহারা এমন? এমন নিরানন্দময় মানুষেরা কোন্ আনন্দের খাদ্য দিয়া মানুষকে পরিতৃপ্ত করিবে।

অধিকারী বলিল, ওঁরা শুনবেন না—এক ঘণ্টার মধ্যে যাত্রা বসানো চাই।

লম্বা রোগামত একজন লোক সাজের বাক্স নামাইতেছিল, বাক্সটাকে ধপাস করিয়া মাটিতে রাখিয়া কহিল, মানে? আমরা মানুষ, না—

অধিকারী বলিল, অবশ্য না খাইয়ে তোমাদের আসরে নামাচ্ছিও না, এতে যা দায়দোষ আমার ঘাড়েই পড়ুক।

লম্বা রোগামত লোকটি কহিল, এক ঘণ্টার মধ্যে খাওয়া মানে তো—খিচুড়ি! ওর মধ্যে আমি নেই।

অধিকারী বলিল, ধর কনসার্ট আরও আধ ঘণ্টা বেশি দিলে ম্যানেজ করতে পারবে না?

ম্যানেজ করতে পারি সবই—করব না। ছেলেরা কেউ তো এগুবে না হাঁড়ি ধরতে! একটু থামিয়া বলিল, আর লঙ্গরখানার মত যখন তখন খিচুড়িই বা খেতে গেলাম কেন!

একজন কালো ও বেঁটে মত লোক বলিল, আমার পেটের অবস্থা ভাল নয়—

অধিকারী বলিল, খিচুড়িটা খারাপ কিসে! খানিকটা ঘিয়ের ব্যবস্থা না হয় করা যাবে। বেশ করে কড়াইশুটি দিয়ে—

মাছ চাই। মাছ ভাজা না হ'লে—

আচ্ছা—আমি নিজে বাজারে যাব'খন।

উহুঁ—আমরা যাব। তুমি মাছ আনবে বটে, সে সধবার একাদশীর নিয়ম রক্ষার মত। ওতে আমরা রাজী নই।

আর আমাদেরও তো শরীর। কুষ্টে থেকে গেলাম মেহেরপুর—সেখান থেকে রেলবাজারে দু'রাত্তির গেয়ে আজ সকালে এসে পৌঁছলাম এখানে। খাওয়ার কন্‌ট্যাক্‌টো পর্য্যন্ত নিয়ে কেন যে বায়না নাও! তোমার দু'পয়সা থাকে—আমাদের থাকে কচু। লোকটি তাহার শীর্ণ পঞ্জরাস্থি প্রকটিত করিয়া দেহ দোলাইয়া একরূপ রুখিয়া উঠিল।

অধিকারী তাহার পানে চাহিয়া কহিল, সত্য তোমায় দিয়ে আর ফিমেল পার্ট চলে না। গানের গলা নষ্ট করেছ গাঁজা খেয়ে।

কোটরগত চক্ষু ঘুরাইয়া সে কহিল, দোষ আমার? গলার তোয়াজ না হ'লে অমনি খোলে গলা! একবেলা ছাইভস্ম গিলিয়ে—একবেলা খোরাকী চার আনা।

অধিকারী বলিল, আমার দল বলেই চার আনা পাও—চাটুজ্জের ওখানে কত দিত হে?

সে সস্তার বাজারে। দাও না বাবা ছ'পয়সা, সঙ্গে সঙ্গে চালের দামটাও নামাও পাঁচে।

নামাবার কর্ত্তা আমি কি না। ছ'পয়সার জায়গায় চার আনা, আমারই কত লাভ! করে দিক্ না কোম্পানী সস্তার বাজার—দেড়শোর জায়গায় পঞ্চাশে বায়না নেব'খন।

বচসার মধ্যে সাজের বাক্সগুলি ভাঙ্গাঘরের মধ্যে তোলা হইল। অসন্তুষ্ট মানুষের সব কথায় সব সময়ে কান দিলে চলে না। অধিকারী সেকথা ভাল করিয়াই জানে। না জানিলে এই যুদ্ধের বাজারে যাত্রার দল চালাইতে পারিত না। কয়মাস আগে সে সঙ্কল্প করিয়াছিল—

দল উঠাইয়া দিবে। লোকের মুখে তুলিবার অন্ন নাই—কোন্ প্রাণে যাত্রা দিবার সথ পোষণ করিবে। কিন্তু বিচিত্র রহস্য এই পৃথিবীর। দুর্ভাগ্য আয়তনে বাড়িলেও কোন কল্পলোক হইতে লক্ষ্মী সম্পদ্ ঢালিয়া দিতেছেন ,হাসিমুখে। তাঁহার প্রসাদপুষ্ট লোকগুলি আজ পূজা-পার্ব্বণের ভার গ্রহণ করিয়াছে। এবং এমন জাঁকজমকের সঙ্গে দেবতার আরাধনা সুরু করিয়াছে—যাহার নজীর আজকার যুবকদের জ্ঞান-বুদ্ধিতে খুঁজিয়া মেলে না। কোন কোন পল্লীর উপর দুর্ভিক্ষের কালো ছায়াটা নামিতে নামিতেও পাশ কাটাইয়া গেছে। কালো বাজারে যাহারা লাল হইয়া উঠিয়াছে সেদিন তাহাদের দয়ায় সেখানকার গ্রাম ও সমাজ রক্ষা পাইয়াছে। সেজন্য লোকগুলি অবশ্য মুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে, মনে করিয়াছে হিংসা। তা করুক, সে নির্ব্বিষ হিংসায় মানুষ কিছু পুড়িয়া মরিবে না। কাহারা বাঁচিলে কাহাদের লাভ সে অঙ্ক অনেক আগেই নির্ভুল উত্তরের সঙ্গে প্রশ্নমালার পিছনে ছাপানো আছে। আপাত লাভটাই যাহারা দেখে দূরের দৃষ্টি তাহাদের ঘোলা। বিনোদ এই কারণেই দল উঠাইয়া দেয় নাই। তাহার কালো বাজারের সুবিধা অবশ্য ছিল না, কিন্তু এই কয়টি মানুষকে যথাসময়ে যৎকিঞ্চিৎ দিয়া জীয়াইয়া রাখার গর্ব্ব সে করিতে ছাড়িবে কেন? চাল সে কিছু মজুত করিয়াছিল। ইহাদের না খাওয়াইয়া কালো বাজারে ছাড়িয়া কিঞ্চিৎ লালও তো হইতে পারিত। কিন্তু জোয়ারে ভাসিয়া-আসা রক্তকে সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। বায়নার বহর দেখিয়া বুঝা যাইতেছে—ভুল সে করে নাই। শুধু অর্থাভাবে ভাল ভাল লোক তাহার দলকে কিছু দুর্ব্বল করিয়া অন্য দলে যোগ দিয়াছে। তা দিক। আজকাল লোকে অভিনয়ের মধ্যে খুঁত ধরে কম। সমজদার লোক না বসে আসরে—না শুনিতে চায় জুড়ির তান

বা বেহালার সুর-বিস্তার। আসর জঁাকাইয়া রাখার জন্য একটা কিছু চাই—তা যে ক্লাসের যাত্রার দলই অভিনয় করুক। যাত্রা শোনে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত অজ পাড়াগাঁয়ের লোক আর ভক্তিগদ্‌গদ্‌চিত্ত মেয়েরা। যাহাদের সম্মুখে করুণ রসটাকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেশন করিতে পারিলে কাহিনীর অসংলগ্নতা বা সংলাপের ভোঁতামি কোনটাই মনকে পীড়ন করে না। তাহাদের মনের গোপন কোণে কারুণ্য প্রতিনিয়তই প্রবলভাবে সুড়সুড়ি দেয়, এবং চোখের জলে গামছা বা আঁচল ভিজিয়া সপ সপ করে। পালা লিখিবার লোক একজন আছে—কিন্তু প্যাঁচের জায়গাগুলি বিনোদের সংশোধনে শুদ্ধীকৃত।

তবু বিনোদ কথায় কথায় হায় রে সেকাল, বলিলেও মনে মনে বলে, সাবাস একাল!

দলের মধ্যে একটি লোককে বিনোদ ভালবাসে। ভালবাসে—কেন না, সে নহিলে দল অচল। তার মাহিনা বেশি, জলপানি বেশি এবং আদরও বেশি। সুকণ্ঠ ছেলে নহিলে দলের মহিমা কেহ স্বীকার করে না। রাখাল বালক বা কৃষ্ণ বা গীতপ্রধান যে কোন কিশোর ভূমিকার জন্য নন্দকে সে অন্য দল হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিয়াছে দুই টাকা বেশি মাহিনা দিয়া। তা নন্দ দলের মুখ রক্ষা করিতেছে। বিনোদ-অপেরা পার্টি বলিতে লোকে অ্যাক্‌টিং বোঝে না—নাটক বোঝে না—বোঝে ওই ছোট ছেলেটিকে। ছেলেটিকে বিনোদ চোখে চোখে রাখে। দলের লোকগুলির চরিত্র বিনোদ জানে। ছেলেটিকে বাগে পাইলে উহারা অনায়াসে ভাঙ্গাইয়া অন্য দলে লইয়া যাইতে পারে। যাহার হাতে এমন গুণান্বিত ছেলে থাকে তাহার কদরও বেশি হইবার কথা। বিনোদ অনেকদিন লক্ষ্য করিয়াছে যে-লোকটি দেবকী

সাজে তাহাকে দেখিলেই ছেলেটি ফিক্ করিয়া হাসে এবং কংসের সঙ্গেও উহার ইসারা চলে। একবার কংস উহাকে টকি দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিনোদের কড়া শাসনে ছেলেটি গাল ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেই···ছোটখাটো ব্যাপার আজকাল সে লক্ষ্য করে না।

ও উমুনে হবে না, আর দক্ষিণ দিকে মুখ করে বুঝি উমুন কাটে? একি চিলু কাটা? যে লোকটি বাক্স নামাইতেছিল সে আসিয়া বিনোদের সম্মুখে ঝাঁঝালো কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

বটে! কোন্ আহাম্মুখ কেটেছে? পূব দক্ষিণ জ্ঞান নেই।

না নেই। সব দেশের পূব দক্ষিণ এক কিনা! বেলা দশটার পর আন্দাজ করতে পার কোন্ দিকে পূব কোন্ দিকে দক্ষিণ? লোকটি ঢোলক বাজায় বলিয়া কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে মাথা নাড়িল।

বেলা দশটায় নিজের পায়ের তলার ছেঁয়া দেখে বুঝতে পার না— আজুলী! তোমার বুঝি ছেঁয়া পড়ে না—

কি—মেয়েমানুষের পার্ট করিস বলে তোর ভারি আষ্পা!

ওরে বাবা—তোদের সাতগুষ্টির পায়ে পড়ি—ব্যগ্রতা করি—থাম। বিনোদ দুইজনের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। কাল রাত্তির থেকে খাওয়া নেই—প্লে নামাতে হবে এক ঘণ্টার মধ্যে। তোদের ঝগড়া শুনলেই কি পেট ভরবে—না পিঠ বাঁচবে?

সে বোঝ গে তুমি, ট্যাকা নিয়েছ যখন খ্যাটের ব্যবস্থা আলবৎ করবে। পাখোয়াজে চাঁটি মারার মত একটা ভঙ্গি করিয়া দুই পা পিছাইয়া গেল।

যশোদা (রোগামত লোকটি) তাহার অলক্ষ্যে মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, আর লক্ষণ বাছলে চলে না, ওতেই কাঠ জ্বালিয়ে দিই গে।

মন্মথ—মন্মথ কোথায় গেলি রে?

এই তো বাজার গেল।

বাজার। ওরে সবাই খাবে কি না খাবে জিজ্ঞাসা করেছিল কি! করে নি? পাঁচুর পেট খারাপ ও খিচুড়ি খাবে না। লক্ষ্মা বলছিল—ওর কে কুটুম আছে, নন্দ তো বায়না ধরেছে পেট ভরে রসগোল্লা খেয়ে তবে নামবে। এই তো তিন জন যদি বাদ যায় তো পোয়াটাক মাছ—

তা বলে একদিন ভাল করে মাছ খাব না! এক পোয়া মাছ বেশি আনলে কি আর ভাঁড়ে খাঁড় খাবে অধিকারী!

বিনোদ বেগতিক দেখিয়া চালার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেখানে যে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল—তাহাতে তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। নন্দ বোঁ বোঁ শব্দে বিড়ি টানিতেছে আর কংস ছোঁড়াটার হাত ধরিয়া হাসিয়া হাসিয়া কি সব অন্তরঙ্গতার কথা যেন বলিতেছে। একটা মোটা অশ্বত্থ গাছের আড়ালে উহারা দাঁড়াইয়া আছে, এবং এই দিকে পিছন ফিরিয়া আছে বলিয়াই বিনোদকে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু চুরি করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে চোর যেমন মাঝে মাঝে চারিদিকে চঞ্চল দৃষ্টিপাত করে—তেমনিই এক অতি অসতর্ক মুহূর্ত্তে কংস বিনোদকে দেখিয়া নন্দর গা টিপিয়া কি ইসারা করিল। নন্দ পিছন ফিরিয়া চাহিয়া অস্ফুট কণ্ঠে যাহা বলিল তাহা বিনোদের কানে গেল। সে একটা অশ্লীল সম্বোধনের ভগ্নাংশ। ক্রোধে বিনোদের কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল—সে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল, নন্দ, ওখানে দাঁড়িয়ে ভারি যে ইয়ার্কি দিচ্ছিস, তোর কেষ্ট সাজতে কত সময় যায় হুঁস আছে!

নন্দ ঘাড় ফিরাইয়া তাহার পানে চাহিল না। শুধু বলিল, না খেয়ে সাজবো নাকি! মুখে রঙ মেখে রসগোল্লা খেতে ভাল লাগে!

বিনোদ দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, খেয়ে নে জন্মের শোধ রসগোল্লা, দু'টি বছর পরে কট্‌কটে গজা খেয়ে দাঁত ভাঙ্গতে হবে। এরই মধ্যে বয়সা ধরে গলার ওকম্মো হয়ে আসছে। প্রকাশ্যে শুধু বলিল, আয়, খাবি আয়।

ফন্তুও বলছে রসগোল্লা খাবে।

আবার একটা অশ্লীল সম্বোধন রসনাগ্রে আসিতেছিল, সামলাইয়া লইয়া বিনোদ বলিল, বলে আপনি খেতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে। তুই খাবি কিনা বল?

ফন্তু বলছে অনেকদিন খায় নি—রসগোল্লা—

নন্দর প্যাঁচ বিনোদ বুঝিতে পারিল। কিন্তু বুঝিলেই সব সময়ে কথা প্রকাশ করা চলে না। কহিল, তা ফন্তুকে না হয় দিস দু'টো, আয়। মনে মনে বলিল, এখানকার বায়না শেষ হ'লে ফন্তেটাকে খসাতে হবে। নইলে কোন্‌দিন আমারই মাথায় ও কাঁঠাল ভাঙ্গবে। অত ভাব তো ভাল নয়।

বাজারের বহরটা বিনোদের কাছে আতিশয্য ঠেকিল। কিন্তু চোরের মায়ের কান্নার মত ব্যথা বাজিলেও প্রকাশের পথ বন্ধ। নন্দটা রসগোল্লায় রীতিমত দাগা দিয়াছে। বিনোদের মনে আছে—ছেলেবেলায় মিষ্ট সে একদম পছন্দ করিত না, এখনও দুইটার বেশি সন্দেশ বা রসগোল্লা খাইলে গায়ে পাক দেয়। আর পেটজোড়া প্লীহা লইয়া নন্দটা এক সরা রসগোল্লা পার করিয়া দিল! রসগোল্লা কি সত্য ও খাইয়াছে, খাইয়াছে পেটের প্লীহা। আর ফন্তুটাকেও চার-পাঁচটা খাওয়াইয়াছে।

যশোদা বলিল, কলাইয়ের ডালের খিচুড়িতে আদা মৌরী বাটা দিতে হবে না? একটু ঘিও তো নেই!

বিনোদ প্রায় রুখিয়া উঠিল, আদা মৌরী ঘি দিয়ে তোয়াজ করে আর একদিন খেয়ো—আজ কোন রকমে নামিয়ে মান রক্ষে কর। ইয়া বড় বড় খয়রা মাছ—খুব সস্তা বুঝি এখানে ?

মন্মথ বলিল, হ্যাঁ—সস্তা না কচু। যুদ্ধের হিড়িকে দুনিয়ার জিনিষে আগুন লেগেছে—সস্তা শুধু মিত্যুটা।

তা অত আনবার দরকার কি ছিল ?

একদিন বৈত না। খেয়ে নাও অধিকারী, দুনিয়ার যা হালচাল—কবে আছ কবে নেই! চোখ টিপিয়া হাত নাড়িয়া সে সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

বিনোদ বলিল, পেয়েছ আমায় ভালমানুষ—নাও খেয়ে।

দেখ অধিকারী চোখ রাঙিয়ো না। চুলোর যাত্রা ছেড়ে দিয়ে যদি জনমজুরগিরি করি—দিন পাঁচ সিকে আর আধ সের চাল, আমেরিকানদের আমীরী মেজাজ।

আবার কথায় কথায় লাথি মারতেও মজবুত, তোদের শরীরে আছে কি যে খাটবি!

মন্মথ হাসিয়া বলিল, ওতেই মেরে রেখেছে অধিকারী! যাত্রাদলের রাজা সেনাপতি উজীর সেজে ভেতরটা ওর বক্তিমে গুলোর মত ফোঁপরা ঝর ঝরে।

নাও—খুব বক্তিমে হ'য়েছে।

এবার থিয়েটারে ঢুকবো। শুন্‌চি শহরের পাঁচটা থিয়েটার ভাল চলচে, আরও দু'টো খুলব খুলব করছে।

তাই যাস। মাছগুলো তরকারিগুলো পাঁচজনে কুটে বেছে দে; যশোদা একা সব করতে পারে!

না গো অধিকারী, আমরা জটিলে কুটিলে নন্দ ঘোষ—সবাই হাত লাগাচ্ছি! আগে খ্যাঁট তারপর—হুঁ!

তরকারি কুটিতে কুটিতে তারণ বলিল, বাবুদের জুতটা দেখছিস মোনা ? থিয়েটারের স্টেজ কেমন বেঁধেছে !

দেখেছি। সেই দুঃখেই তো বলছি—এবার থিয়েটারে ঢুকবো। তিন ঘণ্টায় সব কিলিয়ার—ফরসা। দেড়শো দু'শো নম্বরের পার্ট মুখস্থ করতে হবে না, মাইনেও মোটা।

পারবি ?

কেন—যারা থিয়েটার করে তারা মানুষ নয়। তিন ঘণ্টার জন্যে কত সাজগোজ, কেমন থ্যাটের জুৎ। চা-পান-সোডা-লিমনেড-বিড়ি-সিগ্রেট—

উহুঁ-হু—খিচুড়িটা নেড়ে দাও যশোদা, ধরা গন্ধ পাচ্ছি যেন।

যশোদা বলিল, সাত সের চেলে ডেলে নাড়ুক দিকি কার বাবার সাধ্যি ! আর এই তো কাঁচা ধলা আঁকড়ার রলার হাতা। বলিয়া দুই হাতে মন্থন দণ্ডটা সাপটিয়া ধরিল। হাতের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল এবং লোকটিও ঈষৎ কুব্জ হইয়া গেল।

আহাহা—অতটা জোর দিও না যশোমতী, ইটের উনুন—আর মাটির হাঁড়ি ভুলো না।

জোর থাকলে তো দেবে—তুই চুপ করে মাছ কুটে যা দিকি।

যশোদা মুখ ঘুরাইয়া কহিল, তোদের লজ্জা করে না ও কথা বলতে ! কত দুধ ঘি ক্ষীর ছানা খাই যে জোর দেব দস্যির মত।

আহা তোমারই তো শ্রীগোকুল যশোদে। আয়ানকে বললেই—

মস্করা রাখ। ওকি মাছ কোটার ছিরি !

ছুরি দিয়ে এর বেশি হয় না।

এমন সময়ে ঢং করিয়া প্রথম ঘণ্টা বাজিল।

তারণ হাত গুটাইয়া বলিল, উঠলাম ভাই। বেগুন কোটা রেখে এখন তবলা নিয়ে আসরে বসি গে।

পাখোয়াজ, মন্দিরা, বাঁশী, হার্মোনিয়ম প্রভৃতি লইয়া কয়েকজন আসরে গিয়ে বসিল। অল্প সময়ের মধ্যে উহারা কিছুটা সুশ্রী ও সুশোভন হইয়াছে। তেল-জলের হাত দিয়া মাথার চুলগুলিকে কিছু বশীভূত ও চকচকে করিয়াছে; চিরুনি দিয়া সেখানে জুৎসই টেরিও কাটিয়াছে কেহ কেহ। ট্রেনের কাপড় বদলাইয়া পোষাকী মিহি ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবী পরিয়াছে। পাঞ্জাবীর কাঁধের ছিদ্র ঢাকিতে বহু পুরাতন পাটকরা ফরসা চাদরখানি কাঁধের উপর ফেলিয়াছে। আসরে ঢুকিবার আগে একটি করিয়া পান মুখে দিয়া ঠোঁট দু'খানিও লাল করিয়াছে। ভাঙ্গা চালার পাশে আর সাজানো আসরের মাঝখানে—এরা অল্প সময়ের মধ্যেই মানাইয়া লইতে পারে।

যন্ত্রের সুর বাঁধিতে গেল আধঘণ্টা, একখানা গতেও পনেরো-কুড়ি মিনিট। দর্শক সমাগম হইতেছে, এবং মাঝে মাঝে হাততালির ধ্বনি উঠিতেছে। এক দল ফাজিল ছোকরা সব আসরেই ওটি নিয়মিত মহলা দিয়া থাকে। সে জন্য দলের কেহ ভ্রূক্ষেপ করে না। বিশেষ করিয়া এই দলটি। এরা জানে কম টাকা লইয়া যে জিনিষ দিতেছে—তাহাতে দর্শক ভুলাইবার কলা-অংশ সামান্যই। বিনোদ তো কথায় কথায় বলে, বেশি গুড় দিলেই বেশি মিষ্টি হয়, মশায়। আমাদেরও ডুপ্লিকেট স্টাফ্ আছে—বেশি টাকা না পেলে তারা নামে না।

ওদিকে খিচুড়ি নামিয়াছে। বেগুন ভাজা ও মাছ ভাজাও নামিল বলিয়া। যশোদা এক ফাঁকে মুখে সাদা গুঁড়া মাখিয়া খানিকটা তৈয়ারী হইয়াছে। কামাইবার সময় নাই। মুখের মসৃণতা কম। পুরু করিয়া রং মাখিয়া দিনের বেলায় একটু কিম্ভূতকিমাকার দেখাইতেছে বটে, কিন্তু শাড়ী ও চুল পরিলে মানাইয়া যাইবে। তারপর প্রথম অঙ্কের পর অনেকখানি সময় পাওয়া যাইবে। সেই অবসরে

ক্ষৌরকর্ম্ম সারিয়া ভাল করিয়া পেণ্ট করিয়া দর্শন-ডা'লি হইবার চেষ্টা সে করিবে।

বিনোদ আসিয়া বলিল, আঃ এখনও আসরে সং দেওয়া হ'লো না—লোকে ক্ষেপে উঠেছে। ও যশোদা, খিচুড়িটা না হয় পরেই খেয়ো, একটা সিন সেরে দিয়ে এসো গে।

যাই। একখানি বড় সরায় গোটা-চারেক বড় খয়রা মাছ ও খিচুড়ি ঘরের এক কোণে কলাপাতা ঢাকা দিয়া রাখিয়া সে বলিল, এই আমার খাবার রইলো—এসে খাব। তোমরা সব বেড়েটেড়ে নাও।

তা আসরে লোক মন্দ হয় নাই। বেড়ার চারিপাশ প্রায় ভর্ত্তি হইয়া আসিল, ফরাস পাতা আসরের মাঝখানটা যা ফাঁকা। টেকো মাথার চারিপাশে বিরল কেশের মত যন্ত্রী ও দুই-একজন অতি বৃদ্ধ যে-কোন-পৌরাণিক-পালা-ভক্ত ভদ্রদর্শক শোভা পাইতেছেন। আরও সম্ভ্রান্ত লোক আসিবেন বলিয়া সাধারণ লোককে সেখানে বসিতে দেওয়া হয় নাই। অতি দুঃসাহসী কয়েকটি ছেলে একবার বেড়া টপ্‌কাইয়া ফরাসে বসিতেই কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের উঠাইয়া দিয়াছেন। তাহারাও মনোক্ষোভবশতঃ যাত্রার দলকে উপলক্ষ্য করিয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের উদ্দেশ্যে ঘন ঘন করতালি দিতেছে।

ঢং করিয়া একটি ঘণ্টা বাজিল। ক্রন্দনমুখী যশোদা ও নন্দ আসরে প্রবেশ করিলেন। নিষ্ঠুর অক্রূর কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য ব্রজে পদার্পণ করিয়াছেন। ব্রজমণ্ডলে এ দুঃসংবাদ চাপা নাই।

ক্রন্দনটা যশোদার স্বভাবগত। মাংসলাবণ্যহীন শরীরে রমণী-সৌকুমার্য্যের অভাবটা সে কোমলতম বৃত্তি-অস্ত্রের সাহায্যে পূরণ করিয়া লয়। নহিলে লোমশ শীর্ণ হাত, কোটরগত চক্ষু ও কথা বলিবার সময় বহুশিরাপ্রকটিত গলদেশ যে কোন শিশুর পক্ষে দৃশ্য-শূল। যশোদাও

তা জানে! জানে বলিয়াই কণ্ঠের কম্পনে ও অশ্রুর বর্ষণে দর্শকহৃদয়ে প্রথমেই এমন প্রচণ্ড ঘা দেয়—যাহা চোখের পথ এড়াইয়া মনের মাঝে বিপ্লব বাধাইয়া দিবেই। এটি অবশ্য পাড়াগাঁ'র দর্শক কাবু করিবার কৌশল। তবে একথা যশোদা জানে এবং অধিকারীও জানে—করুণ বা ভক্তিরস বেশিদিন আর ভক্তি-বিহ্বল দর্শকবৃন্দকে ঠেকাইতে পারিবে না। এত বড় দলের জন্য আলাদা পাচকের ব্যবস্থা তাই অধিকারী করে নাই, এবং সে উপরি পরিশ্রম যশোদাও মানিয়া লইয়াছে।

হয় তো পথের ক্লান্তি, হয় তো বা ক্ষুধার জ্বালা—করুণ রসের প্রথম পর্য্যায়টা তেমন জমিল না। গত রাত্রির অনিদ্রাও হইতে পারে। যশোদার চক্ষু উদর এবং মনও হয় তো জ্বালা করিতেছিল। সে উত্তাপে চোখে তো জল আসিলই না—কণ্ঠস্বরটা কেমন বিকৃত বোধ হইল। ভক্তিমূঢ় দর্শকরাও প্রাণহীন খেদোক্তিতে হাসিয়া উঠিল। বুদ্ধিমান অধিকারী তাড়াতাড়ি গীতকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে আসরে নামাইয়া দিল। দৃশ্যটা আর হাসির তোড়ে ভাসিয়া গেল না। বাহিরে পোষাকহীন ছেলেটা খোলা-ছাড়ানো চিংড়ি মাছের মত দেখাইলেও আসরে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে অলকাতিলকাসজ্জিত ডবডবে মুখখানিতে দর্শকচিত্তে সহানুভূতি জাগাইল। কণ্ঠস্বরটি তার মিষ্ট। অধিকারীর রসগোল্লা-প্রসাদাৎ সে মিষ্টত্ব অবশ্য নহে।

শ্রীকৃষ্ণের পর যশোদার গান দিলে হয় তো শোভন হয়—এককালে যশোদা গাহিতও, কিন্তু সে অনেককালের কথা। এখন কর্কশ কণ্ঠে সুর ফোটে না—গ্রীবাদেশে সরুমোটা অনেকগুলি শিরা শুধু ফুলিয়া উঠে। গানটা অধিকারী বাদ দিয়াছেন।

একে দশ মিনিটকালব্যাপী ক্রন্দন-বক্তৃতা—তায় সেকেলে ঢং। রক্ষা যে একালের কলারসিক দর্শকরা তখনও অনুপস্থিত। যাত্রার

নাম ও পালা শুনিয়া তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন। কেহ দূর হইতে উঁকি দিয়া আসরটা আন্দাজ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, কেহ দিবা নিদ্রা অন্তে একবার আসিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। চিকের আড়ালে মেয়েদের ভিড় জমিয়াছে; উলঙ্গ অর্দ্ধউলঙ্গ ছেলের দল মজা দেখিবার জন্য জুটিয়াছে আর বহুদূর গ্রাম হইতে আসিয়াছে চাষী মজুরের দল। ইহারা এক সঙ্গে মিলিবার আনন্দেই মশগুল। আত্মীয়স্বজনের তত্ত্ব, শাশুড়ীর অত্যাচার, গহনার ফর্দ্দ, স্বামী দেবর ছেলে ভাই জা ননদ প্রভৃতির দোষগুণ, চাষ আবাদের কথা, দুর্ভিক্ষেব কথা, ভগবানের দোহাই ইত্যাদির ফাঁকে যাত্রার ভক্তিরসটুকুতে মন ইহাদের মজিয়া আছে। সুতরাং যশোদার দশ মিনিটের সানুনাসিক বক্তৃতা এক ঘণ্টায় পৌছাইলেও ক্ষতি নাই!

তারপর অক্রূর আসিলেন। প্রকাণ্ড দাড়ির চাপে তাঁর বক্তব্য অধিকাংশই বোঝা গেল না, কিন্তু ব্যাপারটি তো কাহারও অজানা নহে। অভিনয় এইভাবে চলিতে চলিতে সহসা যশোদার ভাবাবেগ আসিল। গোপালকে কোলের মধ্যে টানিয়া সে হাউ হাউ কবিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে কান্নায় এতটুকু ফাঁকি ছিল না; শ্রোতারাও গল্প আলোচনা থামাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কান্নাটা এত সহজে আসে আর এত সংক্রামক! লোকচিত্তজয়ের এতবড় অস্ত্র আর নাই। কৃষ্ণ বিদায় লইবার মুখে যশোদা সপ্রশংস করতালি লাভ করিল।

এই মুহূর্ত্তে অবশ্য অন্য কিছু ভাবা সম্ভব নয়, অবসর মুহূর্ত্তে যশোদা ভাবে, কয়মাস পূর্ব্বে এর চেয়ে করুণতম ক্রন্দনে মানুষ ভুলিত না কেন? এবং আসর ছাড়িয়া বাহিরে গেলেই এই সত্যকার বেদনা অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায় কেন?

নকল দিয়া মানুষের চিত্ত জয় করা হয়ত সহজ, কিন্তু আসলকে সে

কি সত্যই মনে মনে ভয় করে? দুঃখীর দুঃখে মন গলে এবং মন কঠিন হয়। গলে সহজাত প্রবৃত্তিবশে—কঠিন হয় আত্ম-দুর্দ্দশার ছবি স্মরণে আনিয়া। যে সহজাত দয়াবৃত্তি সর্ব্বদাই মানুষকে ভাসাইবার আয়োজন করিতেছে, সেই সহজাত প্রবৃত্তিবশেই তার আত্মরক্ষার চেষ্টা। এতটা দার্শনিক মনোভাব যশোদার নাই, তবে ওই রকম কথা সে প্রায়ই ভাবে। তাহারও সংসার ছিল, দু'টি মেয়ে একটি ছেলে ও বউ ছিল। যাত্রার আনুকূল্যে সংসার অবশ্য চলিত না। উহারা নিজেদের গতর খাটাইয়া নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিত। অধিকারী হিসাবের বাহিরে একটি পয়সাও দেয় না; বকশিস বলিয়া কোন আসরে আজকাল কিছু পাওয়া যায় না। বায়নার টাকা দিয়া দলটাকে কেনা গোলামেরও অধম রূপে দেখাটাই একালের রীতি। কিন্তু সে সংসারও আজ যশোদার নাই। কয়েক মাস আগের মন্বন্তর সব কয়টি প্রাণীকেই ভাসাইয়া লইয়াছে। জনশ্রুতি বলে, বউ তাহার আজও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু সে মূল্য সমাজ স্বীকার করে না, যশোদাও না। কোলের মেয়েটাকেও অন্তত যদি পাওয়া যাইত! আর বড় ছেলেটার কথা মাঝে মাঝে মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে আবেগ আসিয়া বুকের বেদনাকে চোখের জলে মুক্তি দেয়। এবং প্রায়ই তা ঘটে অভিনয়-আসরে গোপালকে মথুরায় বিদায় দিবার আয়োজনে। ভাবে, যদি সে পেটের জ্বালায় দেশ দেশান্তরে না ভাসিয়া বেড়াইত তো সংসার তাহার মন্বন্তরের ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হইত না। এক বেলা খাইয়া আর এক বেলার ক্ষুধা চাপিবার কালে বউটির উপরও ঈষৎ সহানুভূতি জাগে।

এত দুঃখেও দল ছাড়িবার কল্পনা তার মনে ঠাঁই পায় না। নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস নাই, মানুষের মমত্ববোধের উপর সে সন্দেহবান। দেশ-দেশান্তরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার।

আসর ছাড়িতেই ক্ষুধাটা প্রচণ্ড বোধ হইল। ক্রন্দনে রীতিমত কসরৎ হয়। গুরুতর শোকে হয় তো আর সব বৃত্তি চাপা পড়ে—কিন্তু লঘু শোকের পর ক্ষুধার তাড়না স্বাভাবিক।

ভাঙ্গা চালার মধ্যে হাসি ঠাট্টাটা যশোদাকে দেখিয়া প্রবল হইয়া উঠিল। সে মুখ খিঁচাইয়া কহিল, আ-মরণ, হেসে গড়িয়ে পড়ছো যে সব! সিনটায় কেমন কেলাপ পেলাম—

একজন বলিল, কান্না তোমার জমে যশোদে, তাই তো আমরা হাসি। তুমি হ'চ্ছ ভেটার্ণ কাঁদিয়ে।

কান্না অমনি আসে না। আরও কি তিক্তকথা বলিতে গিয়া যশোদা জিহ্বাকে শাসন করিল। কত বড় নিষ্ঠুর সত্যকে সে প্রকাশ করিতেছিল!

যাক খেয়েছ তো? পেট ঠাণ্ডা হলে হাসিটা জমে ভাল।

পাতা চাপা খিচুড়ির সরাখানা হাতে তুলিয়া সে আলোর ধারে আসিল।

নন্দ শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গিতে বলিল, মাগো, বড় খিদে, ক্ষীর সর ননী কিছু থাকে তো খেতে দে।

লোকগুলি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সরার উপর হইতে কলাপাতা উঠাইয়া যশোদার কিন্তু ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষুধার তাড়না—তার উপর পরিহাস। সরার খিচুড়িকে খানিকটা খাবলাইয়া লইয়াছে—বেগুন ভাজা নাই, মাছ ভাজাও না। কতদিন সে মাছ খায় নাই! বাছিয়া বাছিয়া সেরা চারিটি খয়রা মাছ সে নিজের জন্য রাখিয়াছিল। নিজের পরিশ্রমের জিনিষ না রাখিবেই বা কেন! কিন্তু যাহারা পরিশ্রম করে না, বসিয়া খায়—তাহারই এই সামান্য সুবিধাটুকুতে আপত্তি করে। হিংসা ছাড়া কি!

কিন্তু কৃষ্ণবেশী নন্দ ক্ষতি করিবার কৌতুকে সর্ব্বক্ষণই চঞ্চল হইয়া আছে। ভাবের আতিশয্যে মাঝে মাঝে ওকে ভাল লাগে—মাঝে মাঝে ঘৃণা হয়। এ কাজ নিশ্চয়ই ওই ছেলেটার—আর পিছনে উস্কানি আছে ওই হিংসুক লোকগুলির। ক্ষোভে তাহার চোখ ফাটিয়া জল পড়িতেছিল—নিদারুণ ক্রোধে তাহা শুকাইয়া গেল। এবং হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া খিচুড়িভর্ত্তি সরাখানা সে নন্দর দিকে ছুড়িয়া মারিল। অতিরিক্ত কাঁপুনির দরুণ সরাখানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মাটির দেওয়ালে ঠাস করিয়া লাগিল এবং দেওয়ালের খানিকটা মাটি ভাঙ্গিয়া খিচুড়ির সঙ্গে মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িল।

সকলে আর একবার সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত যশোদা শ্রীকৃষ্ণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ভাগ্যে সাজঘরটা কিছু দূরে ছিল এবং অভিনয়রসে দর্শকবৃন্দ ছিল মগ্ন—গোলমালটা বাহিরে পৌঁছিল না।

অধিকারী ছুটিয়া আসিয়া ধমক দিল, চাবুক মেরে দূর করে দেব সব দল থেকে। নন্দর কান ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া পেণ্টারের সামনে দাঁড় করাইয়া দিয়া কহিল, ইয়ার্কির আর জায়গা পাস নি—পাজা কোথাকার। শীগ্‌গির মুছে ফেল মুখ—দেরি হ'লে চাব্‌কে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে দেব। ইস্টুপিড। ঘর ছাড়িবার কালে ভূপতিত যশোদার কুণ্ডলীকৃত দেহে একটা লাথি বসাইয়া দিয়া কহিল, ওসব ঢং আমার ঢের জানা আছে। ঘণ্টা বাজলে যদি আসরে না দেখি তো—

শাসাইতে শাসাইতে অধিকারী চলিয়া গেল। আশ্চর্য্য, তেজ কাহারও দেখা গেল না। নূতন অলকাতিলকা আঁকিয়া গালের আঁচড়ের দাগে ব্লু রং ঘন করিয়া মাখিয়া চোখের পাতায় নূতন কাজলের

রেখা টানিয়া বিধ্বস্ত ময়ুর পুচ্ছটিকে যথাসম্ভব গুছাইয়া গীতকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ আসরে প্রবেশ করিল—যথাসময়ে। যশোদাও ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ক্ষুর ভাঁড় বাহির করিয়া কামাইতে বসিল।

বিনোদ মিনতি করিয়া বলিল, এর থেকে টাকা কাটলে দলের লোক না খেয়ে মরে যাবে হাজরামশায়!

হাজরা বলিল, এমন জঘন্য যাত্রার জন্য লোকে যে পালচাপা দেয় নি ভাগ্য বলে মেনো। গ্রাম ভাল, তাই পিঠের আস্ত চামড়া নিয়ে মানে মানে বিদেয় হ'চ্ছ। খেতে ওদের দাও নাকি? ওই বৃষকাঠের মত চেহারা সব আসরে নামাতে লজ্জা করে না!

বিনোদ আর কথা বলিল না। দলের মধ্যে আসিয়া বলিল, মারামারি করে তোমরা আমার পালা নষ্ট করেছ, মান নষ্ট করেছ—এ বেলার জলপানি কেউ পাবে না। না পোষায় নিজের নিজের পথ দেখ।

এই আদেশ নূতন নহে—লোকগুলির কাছে হয় তো তেমন নিষ্ঠুরও নহে। পরস্পরের পানে চাহিয়া তাহারা ঈষৎ হাসিল মাত্র! যশোদা শুধু ভাঙ্গা চালার বাহিরে আঁকা বাঁকা মেঠোপথের পানে একবার চোখ তুলিয়া চাহিল। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই পথ-রেখা কখন নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে।